বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

মার্চ-এপ্রিল, ১৯৮১ পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত দাম : ৫০ পয়সা

● কলকাতায় জলবায়ু দূষণ—২ ● নির্যাতনের বিরুদ্ধে চিকিৎসজ্ঞাবিনের ভূমিকা—৬
● 'ভেক' প্রকল্প : ত্বরকযন্ত্রের সন্ধানে—১০ ● পরিক্রমা—১৩
● পত্রিকা প্রসঙ্গে—১৫ ● চিঠিপত্র—১৬

সম্পাদকীয়

বিজ্ঞানের কল্যাণকর প্রয়োগ যেমন সুখী, সমৃদ্ধ সমাজ গড়ে তুলতে পারে আবার তার অপপ্রয়োগ এনে দিতে পারে বিভীষিকাময় ভবিষ্যৎ। পরমাণু বিজ্ঞানকে যেমন মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করা যায়, আবার তার অপপ্রয়োগে হিরোসিমা-নাগাসাকির সৃষ্টিও হতে পারে। অতএব মূল প্রশ্ন বিজ্ঞান কিসের জন্য, কাদের দ্বারা ব্যবহৃত হচ্ছে।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের কথাই ধরা যাক—এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিলো মানুষকে রোগ-যন্ত্রণা, জীবন-সংশয় থেকে বাঁচিয়ে রোগমুক্ত, সুস্থ সবল ক'রে তোলা। কিন্তু চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সমস্ত নীতি নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে এক শ্রেণীর চিকিৎসক বন্দীদের ওপর শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার সংগঠিত করতে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সাহায্য নিচ্ছেন। যদিও আশার কথা পশ্চিমী দুনিয়ায় মানবতা ও গণতন্ত্রের প্রতি আস্থাবান চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা এর বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিবাদ সংগঠিত করছেন।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সুফল গ্রামে-গঞ্জের সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার দিকে এক ধাপ এগিয়েছেন পশ্চিম বাংলার সরকার স্বল্পমেয়াদী মেডিকেল কোর্স চালু ক'রে। যদিও প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই নগণ্য—তাহ'লেও প্রচেষ্টা প্রশংসার অপেক্ষা রাখে। পণ্ডিত মহলে 'গেল গেল' রব উঠেছে। মেডিকেল কোর্সের জাত নিয়ে হুজ্জুতির প্রশ্রয় দেওয়া—নৈব নৈব চ। এই সমস্ত জাত্যাভিমানী চিকিৎসকরা সাধারণ মানুষের আশা-আকাংখার এক কানাকড়িও পূরণ করতে পারেন না, অথচ দেশের সাধারণ মানুষের চিকিৎসার সুযোগ প্রসারিত হওয়ার আশা দেখা দিলেও এঁরা নানা অছিলায় এর সাথে একমত হতে পারেন না। যদি এই স্বল্পমেয়াদী মেডিকেল কোর্স ভবিষ্যৎ তৈরি করার যন্ত্র না হয় তা হ'লে হয়ত কিছু চিকিৎসার সুযোগ সাধারণের মধ্যে এই "হাতুড়ে"রা ছড়িয়ে দিতে পারবেন।

পরিবেশ দূষণের জন্য কলকাতা মহানগরীর জনসাধারণের যেভাবে স্বাস্থ্যহানি ঘটে চলেছে, অচিরেই হয়ত এখানে কারুর পক্ষেই আর সুস্থভাবে বেঁচে থাকা সম্ভব হবে না। এ সংখ্যায় থাকছে কলকাতার পরিবেশ দূষণের ওপর একটি নিবন্ধ।

ব্যয়বহুল বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের অন্তরালে কি চলছে, দেশের অগণিত জনসাধারণ বিনিময়ে কি পাচ্ছেন সে বিষয়ে ভাবতে আমরা বিশেষভাবে আগ্রহী। "ভেক প্রকল্প" শীর্ষক প্রবন্ধে আমরা তা আংশিক জানার চেষ্টা করছি। পরিশেষে, বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের কাছে আবেদন তাঁরা যেন নিজ নিজ প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে তথ্যমূলক নিবন্ধ পাঠিয়ে পত্রিকাকে সমৃদ্ধিশালী করে তোলেন।

জিওলজিকাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার তরুণ গবেষককর্মী শ্রীসুকোমল গঙ্গোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক আকস্মিক মৃত্যুতে আমরা শোকাহত। তাঁর মৃত্যুকে ঘিরে বিভিন্ন মহলে বেশ কিছু সংশয় ও প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে এগুলির নিরসন হওয়া প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। —পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা

কলকাতায় জলবায়ু দূষণ

[The sources of air and water pollutants in Calcutta have been identified and in particular their contribution to pollution has been indicated. The level of Calcutta's air and water pollution has also been discussed. An attempt has been made to draw attention to the deleterious consequences of air and water pollution.]

চারপাশের জীবজগৎ ও জড়জগৎ—মাটি, বায়ু, জল, উদ্ভিদ, প্রাণী ও সভ্যতার নানান সম্পদ নিয়ে এবং বিশেষতঃ উদ্ভিদ-প্রাণীর সঙ্গে পার্থিব পরিবেশের জটিল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় তৈরী আমাদের ইকলজিক্যাল সিস্টেম। আধুনিক শিল্প ও প্রযুক্তিকলার অসামান্য শক্তি এই পরিবেশের ওপর অনিয়ন্ত্রিত এলোমেলো চাপ ফেলে চলেছে। ফলে মানুষের ইকলজিক্যাল সিস্টেমের অতিপ্রয়োজনীয় বায়োলজিক্যাল ও ভৌত প্রক্রিয়াগুলির বুনটের অত্যাবশ্যক গ্রন্থিসমূহ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। পরিবেশের ভৌত, রাসায়নিক বা বায়োলজিক্যাল অবস্থার পরিবর্তন হেতু মানুষের জীবন-বৈশিষ্ট্যের উপরই মারাত্মক ক্ষতিকারক প্রভাব পড়ছে; উপরন্তু ইকো-সিস্টেমের অন্যান্য অঙ্গ যেমন পশু-পাখী গাছপালা, শিল্প, সাংস্কৃতিক-নান্দনিক সম্পদও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। দিনে দিনে মানুষের সমগ্র পরিবেশই কলুষিত হয়ে পড়ছে। এই পরিবেশ দূষণে, পৃথিবীর শহরগুলির মধ্যে লস-এঞ্জেল্‌স ও ব্যাংককের পরেই কলকাতা নগরীর স্থান তৃতীয়। এখানে আমরা এই শহরের বায়ু ও জল দূষণের আলোচনায় সীমাবদ্ধ থাকব। আজ কলকাতার বাতাস এবং এর পশ্চিম তীরে বহমান গঙ্গা বা হুগলি নদী—যে নদী কলকাতার মানুষের জীবনধারণে ও শিল্পে প্রয়োজনীয় জলের মূল সরবরাহক—অপরিমেয় বিষাক্ত পদার্থে ভরে গেছে।

বায়ু দূষণঃ

কলকাতার বাতাসে ভাসমান পদার্থ-কণা, কার্বন মনোক্সাইড, সালফার অক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড, হাইড্রো-কার্বন, হাইড্রোজেন সালফাইড ইত্যাদি পরিবেশ-দূষক জন-স্বাস্থ্যের পক্ষে বিপজ্জনকভাবে বর্তমান। এই শহরের বায়ু দূষণের মূল উৎস হল গঙ্গার দুই তীরের কল কারখানা, পরিবহণ, গৃহ ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের জ্বালানি এবং কলকাতার দু'টি তাপ-বিদ্যুৎ প্রকল্প। খোলা আকাশের নীচে গঙ্গার উভয় তীরে দুই শহরের বায়ু দূষণ পরস্পরকে প্রভাবিত করে বলেই নীচের ছকে[১,২] কলকাতা ও হাওড়ায় পরিবেশ দূষণে বিভিন্ন উৎস-জাত দূষকের দৈনিক পরিমাণ একত্রে দেখানো হয়েছে। অবশ্য বন্ধনী-ভুক্ত সংখ্যাগুলি কেবলমাত্র কলকাতা শহরের তথ্যই নির্দেশ করে।

প্রসঙ্গত, গঙ্গার পূর্ব তীরে পরিবেশ দূষণ উৎস হিসাবে ১০২৭টি ও পশ্চিমতীরে হাওড়ায় ৭৫০টি শিল্প কারখানা চিহ্নিত করা হলেও মাত্র প্রায় ১০০০টি কারখানার (পূর্ব তীরে প্রায় ৬০০টি) তথ্য সংগ্রহ সম্ভব হয়েছে। তাই শিল্পজাত দূষক ১নং ছকে প্রদত্ত পরিমাণের চেয়ে কিছু বেশী হওয়াই স্বাভাবিক।

কলকাতায় প্রতিদিন বসতবাটী ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে ৭২০ মেট্রিক টন কয়লা, ১২০০ মেট্রিক টন কাঠ (এই হিসাবে বেকারির জ্বালানিও ধরা হয়েছে), ১৩০ কিলোলিটার কেরোসিন তেল, ৩০ কিলোলিটার L. P. G ব্যবহার করা হয়; হাওড়ায় এই জ্বালানিগুলির পরিমাণ যথাক্রমে ৩৭০ মেট্রিক টন, ৪২০ মেট্রিক টন, ৭০ কিলোলিটার এবং ২২ কিলোলিটার।

কলকাতা মহানগরীতে দেড়লক্ষ রেজিস্টর্ড যানবাহনের মধ্যে ২৬% অটোমোবাইল ডিজেল চালিত (দৈনিক ব্যবহার ১,১৩,১৭০ কিলো-লিটার) এবং বাকী পেট্রল-ইঞ্জিন (দৈনিক ব্যবহার ১০০,৭৩১ কিলো-লিটার)। দুই শহরে যানবাহন ও লোকোমোটিভ প্রতিদিন গড়ে ২১০ ও ১০৫ মেট্রিক টন বায়ু-দূষক পদার্থ (ধোঁয়া, কয়লা ইত্যাদি) ও গ্যাস উদ্গীরণ করে। কলকাতা বন্দরে প্রতিবছর প্রায় ১১০টি জাহাজ আসে। বাতাসে এদের জন্যে দৈনিক প্রায় ৪৩ মেট্রিক টন দূষিত পদার্থ ছড়ায়।

বায়ু দূষণে ভাসমান পদার্থ কণার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এর মধ্যে সূক্ষ্ম কার্বন-কণা, সীসা, আর্সেনিক, নিকেল ইত্যাদি বিষাক্ত ধাতুচূর্ণ মিশ্রিত থাকে। মূলতঃ পেট্রলের ধোঁয়ায় ভাসমান সীসা নেফ্‌রাইটিস্, স্নায়বিক রোগ, মস্তিষ্কে রক্ত সংবহন জনিত রোগের সৃষ্টি করে।

১৯৭৭ সালের এপ্রিল থেকে ১৯৭৮ মার্চ অবধি এক সমীক্ষায়[১] দেখা গেছে, টালিগঞ্জ অঞ্চলে বাতাসে ভাসমান পদার্থকণার পরিমাণ সবচেয়ে বেশী, ৪৫১-৫০০ মাইক্রোগ্রাম / ঘন মিটার; ডালহৌসি ও হাওড়া অঞ্চলে এই ধূলিকণার পরিমাণ ৪০০-৪৫০ মাঃ গ্রাম / ঘঃ মিঃ এবং ভবানীপুর ও মানিকতলা অঞ্চলে ৩০০-৩৫০ মাঃ গ্রাঃ / ঘঃ মিঃ।

কলকাতা ও হাওড়া শহরে ঐ সময় সারা বছর ভাসমান পদার্থকণার গড় মান ছিল ৩৯০ মাঃ গ্রাঃ / ঘঃ মিঃ—'৭২ থেকে '৭৭ সাল অবধি অনুসন্ধানের ফলে পাওয়া গড় মানের প্রায় সমানই।[৩] টালিগঞ্জ, হাওড়া ও ডালহৌসি অঞ্চলে মাঝে মাঝেই ধূলিকণার মাত্রা ৭৫০ মাঃ গ্রাঃ / ঘঃ মিটারে পৌঁছেছে। শহরে পর্যবেক্ষণের শতকরা সত্তর ভাগ ক্ষেত্রেই এই মাত্রা ২৫০ মাঃ গ্রাঃ / ঘঃ মিটারের চেয়েও বেশী ছিল। বাতাসে বিষাক্ত ধূলিকণার মাত্রা ৮০-১০০ মাঃ গ্রাঃ / ঘঃ মিঃ হলেই মৃত্যুর হার বেড়ে যায়।

কলকাতার অধিকাংশ কলকারখানা উত্তরে অবস্থিত হওয়ায় শীতকালীন বাতাস উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে কারখানা-উদ্গীরিত বায়ু-দূষক শহরের বুকের ওপর বয়ে নিয়ে আসে। সন্ধ্যাকালীন তাপমাত্রা পরিবর্তনে বিভিন্ন উৎস-নিঃসৃত বায়ু-দূষক ঠাণ্ডা বাতাসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে চোখ জ্বালা করা ঘন ধোঁয়াশার সৃষ্টি করে।[৪] বাতাসে ধূলিকণার গড় মাত্রা মোটামুটিভাবে বার্ষিক গড় মাত্রার চেয়ে প্রায় ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। প্রায়শই দিনের বেলায় আলোর অস্পষ্টতা সৃষ্টি হয়। এই প্রাণঘাতী ধোঁয়াশার দৌলতে হাঁপানি, ক্যানসার ও নানারকম শ্বাস-নালীর ও পাকস্থলীর রোগ এই শহরবাসীর আজ নিত্যসঙ্গী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

উপরিউক্ত সমীক্ষায় আরও দেখা গেছে, টালিগঞ্জ, কসবা, তিলজলা, মানিকতলা ও বেলগাছিয়ায় প্রতি বর্গ কিলোমিটার এলাকায় গড়ে প্রতিমাসে যথাক্রমে ৪৩, ২২, ২৪, ১৯ এবং ১৯ মেট্রিক টন বিষাক্ত ধাতুমিশ্রিত ধূলো মাটিতে জমা হয়েছে ও রাস্তার পেট্রল-ডিজেলের সঙ্গে মিশে শহরের মাটিকেও কলুষিত করেছে।

অটোমোবাইলে গ্যাসোলিনের মূলতঃ অসম্পূর্ণ দহনে উৎপন্ন কার্বন মনোক্সাইড অন্যতম বিপজ্জনক বায়ু-দূষক গ্যাস। আশ্চর্যের কথা শহরের বাতাসে এর মাত্রা নির্ণয়ে তেমন কোন পরীক্ষা করা হয় নি। শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে শরীরে প্রবেশ করে এই বিষাক্ত গ্যাস রক্ত-টিসুর প্রয়োজনীয় অক্সিজেনের পরিমাণ কমিয়ে দেয়, অজাত শিশুকে মাতৃগর্ভে বৃদ্ধির জন্যে উপযোগী অতিরিক্ত অক্সিজেন থেকে বঞ্চিত করে। এই গ্যাস অ্যানিমিয়া, রক্ত-বহ-নালী, হৃদপিণ্ড ও ফুসফুসের রোগ এবং অতি-সক্রিয় থাইরয়েডজনিত রোগ ডেকে আনে ও জ্বরে ভোগা রোগীর খুবই ক্ষতিসাধন করে। বাতাসে এক লক্ষ ভাগে এক ভাগ কার্বন মনোক্সাইড থাকলে আট ঘণ্টায় সুস্থ, সবল ব্যক্তিরও মানসিক ভারসাম্য ক্ষুণ্ণ হতে পারে।[৫]

ভবানীপুর, মানিকতলা, টালিগঞ্জ এলাকায় '৭৩ থেকে '৭৮ সাল অবধি বাতাসে সালফার ডাইঅক্সাইডের গড় মাত্রা ছিল ২৩-৩৫ মাঃ গ্রাঃ / ঘঃ মিঃ, ডালহৌসিতে ৩৩-৪১ মাঃ গ্রাঃ / ঘঃ মিঃ, হাওড়ায় ৩১-৫০ মাঃ গ্রাঃ / ঘঃ মিঃ।[৩] কাশীপুরে ৭৭-৭৮ সালে সালফার ডাই-অক্সাইডের এই মাত্রা আগের বছরগুলির গড় মান ৪০ মাঃ গ্রাঃ / ঘঃ মিঃ থেকে বেড়ে ৭০ মাঃ গ্রাঃ / ঘঃ মিটারে পৌঁছেছে। '৭৭-৭৮ সালে শহরে মোট পর্যবেক্ষণের প্রায় ২০ শতাংশ ক্ষেত্রেই সালফার ডাই-অক্সাইডের মাত্রা ৮০ মাঃ গ্রাঃ / ঘঃ মিঃ এবং কাশীপুর, ডালহৌসিতে শতকরা প্রায় দশ ভাগ ক্ষেত্রেই ১০০ মাঃ গ্রাঃ / ঘঃ মিঃ ছাড়িয়ে গিয়েছে।[১] বাতাসে প্রতি ঘন মিটারে ১১৫ মাঃ গ্রাঃ সালফার ডাই-অক্সাইড এবং ১৬০ মাঃ গ্রাঃ ধোঁয়া থাকলেই ব্রঙ্কাইটিস ও ফুসফুসের ক্যানসার থেকে মানুষের মৃত্যু হতে পারে। সালফার ডাই-অক্সাইড শ্বাসনলের ওপরের অংশের দুর্বল টিসুগুলোকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। সালফেশন ক্রিয়া ও জলীয় বাষ্পের যোগাযোগে উৎপন্ন সালফিউরিক অ্যাসিড একেবারে ফুসফুসের মধ্যে প্রবেশ করে টিসুগুলোকে ধ্বংস করে দিতে পারে। নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইডের মাত্রা বেশীরভাগ সময়ই ৫০ মাঃ গ্রাঃ / ঘঃ মিটারের নীচে ছিল (এর গড় মানে বছরে বছরে খুবই অনিয়মিত পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়)। হাইড্রোজেন সালফাইডের মাত্রা ছিল ৫ মাঃ গ্রাঃ / ঘঃ মিঃ অপেক্ষাও কম।[১] বাতাসে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ নাইট্রোজেনের অক্সাইড থাকলে ছোট ছেলেমেয়েরা সহজেই সর্দি-কাশি, ইনফ্লুয়েঞ্জা এবং অন্যান্য শ্বাস-প্রশ্বাসের সংক্রামক রোগের শিকার হয়ে পড়ে। ধোঁয়াশায় হাইড্রো-

সান্তালডিতে পরিবেশ দূষণ

সান্তালডি থার্মাল প্ল্যান্টের ঠিকাদার মজদুর যুক্ত সংগ্রাম কমিটির নেতৃত্বে শ্রমিকরা বিভিন্ন দাবীতে দীর্ঘ 45 দিন (12.2.81 পর্যন্ত) ধরে ধর্মঘট সংগঠিত করছেন। এইসব শ্রমিকদের অনেকের নামে মামলা রুজু করা হয়েছে, অনেকের ওপর নেমে এসেছে ছাঁটাই।

সংগ্রাম কমিটির বিভিন্ন দাবীর মধ্যে আছে—বে-আইনীভাবে ছাই ও পোড়া তেল ছড়িয়ে জমি, ফসল, এলাকার মানুষ ও গবাদি পশুর স্বাস্থ্যের যে সর্বনাশ করা হচ্ছে, তা বন্ধ করা। 12 ফেব্রুয়ারী, 1981 তে সংগ্রাম কমিটির সমর্থনে ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার ডাকে এক জমায়েতের ব্যবস্থা করা হয়। ঐ সমাবেশে উপস্থিত হয়ে বিভিন্ন লোকের সাথে কথাবার্তা বলেও এই অভিযোগের ব্যাপারে আমি অনেক কথা শুনেছি। সামগ্রিকভাবে এর ফলে পরিবেশ দূষণের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। এলাকার মানুষ এ ব্যাপারে ক্ষুব্ধ।

ঐ সমাবেশে বিভিন্ন বক্তা এ ব্যাপারে বক্তব্য রাখেন। নিজেদের বিভিন্ন দাবী-দাওয়ার জন্য আরও দীর্ঘদিন সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার মতো মানসিকতা শ্রমিকদের আছে।

সংবাদদাতা : **অসীম চট্টোপাধ্যায়**
কোলড়া, হাওড়া

কার্বনের যৌগগুলিকে কোন কোন ক্ষেত্রে ক্যানসার রোগের কারণ হিসাবে মনে করা হয়।

১নং ছক

কলিকাতা ও হাওড়া শহরে বায়ু দূষকের পরিমাণ। (বন্ধনীযুক্ত সংখ্যাগুলি কলকাতা শহরের)

বায়ু দূষক	মেট্রিক টনে বিভিন্ন উৎসজাত দূষকের দৈনিক পরিমাণ					
	শিল্প	পরিবহণ	তাপ-বিদ্যুৎ প্রকল্প	গৃহ ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান	মোট	শতকরা উপস্থিতি
১। বায়ুতে ভাসমান পদার্থ	৩৩৫ (২০৮)	১৬ (৮)	১৫৫	৬১ (৪০)	৫৫৭ (৪১৯)	৪৩
২। সালফার ডাই-অক্সাইড	৪৪ (২৯)	৫২ (২৬)	১৫	১১ (৬)	১২২ (৭৬)	১
৩। কার্বন মনোক্সাইড	১৬৪ (৬৮)	২৩৯ (১৭৬)	৩	৫০ (৩৩)	৪৪৮ (২৮০)	৩৫
৪। হাইড্রো-কার্বন	৫২ (৪৩)	২৮ (১৮)	৯	২১ (১৯)	১০১ (৮১)	৮
৫। নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড	১৩ (১১)	৩১ (১৩)	১৯	৭ (৪)	৭০ (৪৭)	৫
মোট	৫৯৮ (৩৫৯)	৩৫৮ (২৪১)	১৯৩	১৫০ (১০২)	১২৯৯ (৮৯৫)	

১ মেট্রিক টন = ০·৯৮৪২ টন = ১০০০ কিলোগ্রাম

এই শহরে হাজার হাজার কংক্রিটের বহুতল বাড়ী দিনের বেলায় যতটা সূর্য তাপ শোষণ করে, রাত্রে ততটা বিকীর্ণ করতে পারে না। ফলে আশপাশের অঞ্চল থেকে তাপমাত্রা কয়েক ডিগ্রী বেশী হয়ে দূষিত বাতাস নিয়ে শহরে এক বিশেষ ধরনের মাইক্রো-ক্লাইমেট্ তৈরী হচ্ছে। এই বিষাক্ত পরিমণ্ডলে দীর্ঘকাল বসবাসের দরুন জন-জীবনে দীর্ঘস্থায়ী দুরারোগ্য ব্যাধির ব্যাপক বিস্তার ঘটছে।

জলদূষণ :

বাতাসের মত জলও মানুষের প্রাণধারণের অপরিহার্য উপাদান। তাই বায়ু দূষণের মত জলদূষণও আধুনিক মানব-সমাজের কাছে এক গুরুতর বিপদাশঙ্কার বার্তা বহন করে এনেছে। স্বাভাবিক অবস্থায় জলে নানা ধরণের দ্রবীভূত পদার্থ, ভাস্যমান পদার্থকণা এবং জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণী থাকে, শিল্পে ও গৃহে ব্যবহার করার পর জলে আরও অসংখ্য পদার্থ যুক্ত হয়। এদের মধ্যে মূল অজৈব উপাদানগুলি হল : সোডিয়াম, পটাসিয়াম, অ্যামোনিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম-ক্লোরাইড, নাইট্রেট, নাইট্রাইট, বাই-কার্বোনেট, সালফেট এবং ফসফেট। গৃহ ও শিল্প নিঃসৃত আবর্জনার জৈব উপাদানগুলি খুব সুপরিচিত নয়, গুণবৈশিষ্ট্যেও অসংখ্য। নাইট্রেট, বিষাক্ত পদার্থ, ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসে দূষিত জল মানুষের স্বাস্থ্যের সমূহ ক্ষতি-সাধন করে, জল দূষণের দূরপ্রসারী ফলস্বরূপ জলজ জীবন, কৃষি, শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

জলীয় আবর্জনাকে দু ভাগে ভাগ করা যেতে পারে : পরিবর্তনীয় ও অপরিবর্তনীয়। পরিবর্তনীয় আবর্জনা মূলতঃ জৈব পদার্থ ও শিল্প-বর্জিত তাপ হতে পারে। গৃহ-নিঃসৃত নর্দমার ময়লা এই জৈব আবর্জনার বিপুল সরবরাহক। জলীয় ব্যাকটেরিয়া এই আবর্জনাকে আত্ম-পরিশোধন প্রক্রিয়ায় জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন ব্যবহার করে স্থায়ী অজৈব পদার্থে রূপান্তরিত করতে পারে। জৈব আবর্জনার পরিমাণ বেশী হলে যথেষ্ট অক্সিজেনের অভাবে আবর্জনার পরিবর্তনে জলে হাইড্রোজেন সালফাইড ও মিথেনের গন্ধ খুবই অপ্রীতিকর হয়ে পড়ে। জলে দ্রবীভূত লবণ ও গ্যাস, ভাসমান ও নিমজ্জমান পদার্থ কণা, বিষাক্ত ধাতুচূর্ণ, কীটনাশক ইত্যাদি অপরিবর্তনীয় আবর্জনার উপাদান হতে পারে।

জলে জৈব আবর্জনার পরিমাণ BOD (বায়োলজিক্যাল অক্সিজেন ডিম্যাণ্ড) ও COD (কেমিক্যাল অক্সিজেন ডিম্যাণ্ড) পরীক্ষার সাহায্যে নির্ণয় করা হয়। নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় জৈব আবর্জনাকে বিশ্লিষ্ট করে স্থায়ী পদার্থে রূপান্তরিত করতে প্রয়োজনীয় অক্সিজেনের পরিমাণ BOD পরীক্ষা থেকে জানা যায়। COD পরীক্ষা জলে জৈব আবর্জনাকে সম্পূর্ণ জারিত করতে প্রয়োজনীয় রাসায়নিক জারক যেমন পটাসিয়াম ডাইক্রোমেটের পরিমাণ নির্ণয় করে। BOD ও COD পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত।

কল্যাণী থেকে বিড়লাপুর সি. এম. ডি. এলাকায় আবর্জনা নির্গমনের ৩৬টি নালী হুগলি নদীতে পড়েছে। এর মধ্যে নদীর পূর্ব তীরে ১৭৫টি এবং পশ্চিম তীরে ১৭১টি অবস্থিত। এই দুই তীর থেকে নদীতে বাহিত দৈনিক আবর্জনার পরিমাণ ২নং ছক২, ৩ থেকে বোঝা যাবে।

২ নং ছক

উৎস	আয়তন	BOD	COD	ভাসমান পদার্থ
	১০৫ ঘ. মি./দিন	টন/দিন	টন/দিন	টন/দিন
গৃহ-নির্গত/পূর্বতীর	১·৬	২৫·০	৮০·০	১০৪·০
গৃহ-নির্গত/পশ্চিম তীর	০·৭	১২·০	৩৪·০	৩২·০
শিল্প নির্গত/পূর্ব তীর	৩·০	৩১·০	২০০·০	২৩০·০
শিল্প নির্গত/পশ্চিম তীর	১·৪	২১·০	৯৯·০	৪৮·০
বিভিন্ন নালা-নির্গত	৭৪·৭৪	৫১·৭	১৮১·৪	১৩৯২·৫
বিবিধ (ওয়াটার ওয়ার্কস্, পাওয়ার হাউস নির্গত)	৭১·৫০	৩০·৫	৪৫·৯	২৭০·১
মোট	১৫২·৯৪	১৭১·৮	৬৪০·৩	২০৭৬·৬

এই বিপুল পরিমাণ আবর্জনায় মূল জল-দূষক উৎস হল নদীর দু' তীরে কাগজ-কল, ভাটিখানা এবং রেয়ন, ইষ্ট, চামড়ার রঙ ও বার্নিশের কারখানা। জানুয়ারী থেকে জুন অবধি অলবণাক্ত জলের (fresh water) অভাবে নদীতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ খুবই কম থাকে (সারা বছরের মাত্রা ৪-৯ মিঃ গ্রাম/লিটার)।

১৯৭৪-'৭৫ সালের এক সমীক্ষায়[৬] টালির নালা বা আদি গঙ্গায় ৭২টি জলীয় আবর্জনা নির্গম পথ ও অসংখ্য খাটাল চিহ্নিত করা হয়। টালির নালায় নির্গত দৈনিক আবর্জনার পরিমাণ ১১৩, ৭৯০ ঘ. মি.— ১৯·৪ টন BOD, ৬১·৪ টন COD এবং ৬৭·৬ টন ভাসমান পদার্থ। এই মোট আবর্জনার ৭৩% BOD, ৬৮% COD এবং ৪২% ভাসমান পদার্থ ৮টি নির্গম পথ দিয়েই প্রবাহিত হয়। এদের মধ্যে আবার একটি রসুই বনস্পতি কারখানার আবর্জনা (দৈনিক ৬·৫ টন BOD, ১৩·৬ টন COD, ৩১ টন ভাঃ পদার্থ) এবং আরেকটি ইস্টার্ণ ডিস্টিলারির আবর্জনা (০·৯ টন BOD, ১·৫ টন COD এবং ০·২ টন ভাঃ পঃ) বহন করে এবং সবচেয়ে বেশী পরিবেশদূষক। টালিগঞ্জ ব্রিজ ও কালিঘাট ব্রিজের মধ্যে টালির নালা দূষিত পদার্থ ও ব্যাকটেরিয়া দূষণে সবচেয়ে বেশী বিষাক্ত; এখানে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ গড়ে প্রতি লিটার জলে মাত্র ২·৬-২·৯ মিলি গ্রাম থাকে।

হুগলি নদীর জল কলকাতা, হাওড়া ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় জনসাধারণের ব্যবহারের জন্যে সরবরাহ করা হয়। উত্তরে নবাবগঞ্জ— বৈদ্যবাটী থেকে দক্ষিণে গার্ডেনরীচ-শিবপুর এই ৩৫ মাইল নদী এলাকায় চারটি জল সরবরাহ ব্যবস্থা বর্তমান এবং আরও দুটি প্রস্তাবিত। এইসব সরবরাহ ব্যবস্থার উৎসমুখে নদী জলে ক্লোরাইড ঘনত্ব ১৯৭৫ সালেই সর্বত্রই সহন-সীমা ৬০০ মিঃ গ্রাঃ/লিটার ছাড়িয়ে গিয়েছিল। BOD-র মাত্রা ছিল ৩ মিঃ গ্রাঃ/লিটারের চেয়েও বেশী। ১৯৭৬-'৭৭ সালের এক সমীক্ষায়[৭] দেখা যায়, ফরাক্কার অলবণাক্ত জলের প্রভাবে নদী জলে ক্লোরাইড ঘনত্ব অনেক কমে আসলেও, দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ সামান্যই বৃদ্ধি পায়, কিন্তু BOD মাত্রা, ব্যাকটেরিয়া দূষণ প্রায় অপরিবর্তিতই থাকে। গার্ডেন রীচ, শ্রীরামপুর, হাওড়ায় জল সরবরাহ ব্যবস্থার মুখে ব্যাকটেরিয়া ঘনত্ব, বিশেষতঃ ভাঁটার সময় খুবই বেশী, গার্ডেন রীচে সবচেয়ে বেশী (টালির নালার আবর্জনাই এর কারণ); পলতা ও কামারহাটিতে অপেক্ষাকৃত কম। নদীতে শিল্প দূষকের প্রভাবে হাওড়া ব্রিজের দক্ষিণে নিম্ন ধারায় ফাইটো-ও জু-প্ল্যাঙ্কটন খুঁজে পাওয়াই যায় নি, নদীর ওপর এলাকায় এরা সংখ্যায় ছিল সামান্যই। সেন্ট্রাল ইন্‌ল্যাণ্ড ফিশারীর এক রিপোর্ট অনুযায়ী বারাকপুরের নীচে নদীতে বিষাক্ত জলে মাছের পরিমাণ অনেক কমে গিয়েছে। কলকাতা ও হাওড়ার স্নানের ঘাটগুলি ভয়ঙ্কর ব্যাকটেরিয়া দূষণে বিষাক্ত হয়ে পড়েছে, এই দূষিত জল পানে ও স্নানে অন্ত্র ও পাকস্থলীর বিভিন্ন রোগ এমন কি পাকস্থলীর ক্যান্সার পর্যন্ত হতে পারে বলে মনে করা হয়, তাই পরিশোধন ব্যতিরেকে নদীর এই বিষাক্ত জল জনসাধারণের ব্যবহারে সম্পূর্ণ অনুপযোগী। এ ছাড়া হুগলি নদী দ্রুত মজে যাওয়ায় কলকাতা-হাওড়ার কাছাকাছি নদীতে বিশাল বিশাল চর জেগে উঠছে। ফলে ক্রমাগতই জল সরবরাহ কমে আসছে, জল দূষণও বেড়েই চলেছে। প্রতিকারে ব্যবস্থা গ্রহণে তৎপর না হলে এই নদী-দূষণ অচিরেই জনজীবন বিপর্যস্ত করে ফেলতে পারে।

উপসংহার:

পরিবেশ দূষণে জীব-জগৎ বিশেষতঃ মানুষ, প্রকৃতি ও পরিবেশের মধ্যে ইকলজিক্যাল ভারসাম্য বিনষ্ট হয় বা হওয়ার উপক্রম ঘটে। জীবন-ধ্বংসকারী এই পরিবেশকে তাই কলুষমুক্ত করতে চেষ্টা না করে শুধুমাত্র অ্যান্টিবায়োটিকে রোগের চিকিৎসা করায়, রোগ জীবাণুর প্রতিরোধ শক্তি ক্রমাগতই বেড়ে যাচ্ছে এবং সাধারণ রোগও অনেক সময় দুরারোগ্য হয়ে উঠছে। তাই এখনই প্রকৃতিকে মানবিকরণের দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা একান্তই দরকার। তাহলে, কলকারখানা, অটোমোবাইল নিঃসৃত বিষাক্ত গ্যাস ও ধোঁয়াশা থেকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বিপুল পরিমাণ কার্বন, সালফার, সীসা, নিকেল, সিলিকন, পারদ এবং অসংখ্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিক পদার্থ উদ্ধার করে পরিবেশকে বিশুদ্ধ রাখা যায়। পরিবর্ত ব্যবস্থা হিসাবে উন্নত মানের কয়লা, ডিজেল ইঞ্জিনে জ্বালানী হিসাবে গ্যাস, উন্নত ধরনের দহন প্রক্রিয়া এবং কারখানায় কারখানায় ৮০-১০০ মিটার উঁচু চিমনি ব্যবহার করলে বায়ুদূষণ অনেকাংশেই কমিয়ে আনা যায়। জলদূষণ নিরোধে গৃহ ও শিল্পজাত আবর্জনা ধাপে ধাপে রাসায়নিক পদ্ধতিতে পরিশোধিত করা একান্তই প্রয়োজন। মুনাফা-সর্বস্ব সমাজই

এর প্রধান অন্তরায়। ভারতীয় পার্লামেন্টে পরিবেশ দূষণ বিরোধী বিল গৃহীত হলেও সরকারী কলকারখানা ও যানবাহনই অন্যান্যদের মতই আইন লঙ্ঘনকারী। তাই এই শহরে আগামী দিনে কলুষিত পরিবেশের সংহার থেকে মুক্তি পেতে এক সচেতন জন-আন্দোলনের প্রয়োজন আজ সবচেয়ে বেশী অনুভূত হচ্ছে।

সূত্র :

১। এয়ার পলিউশন সার্ভে, ক্যালকাটা এণ্ড হাওড়া (এপ্রিল, ১৯৭৭—মার্চ, ১৯৭৮), ন্যাশান্যাল এনভিরনমেণ্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ ইনষ্টিটিউট (নীরী), নাগপুর, স্পনসর সি. এম. ডি. এ.।

২। ক্যালকাটা মেট্রোপলিট্যান স্ট্যাটিস্টিক্স, সি. এম. ডি এ. ১৯৮০।

৩। এয়ার পলিউশন সার্ভে ক্যালকাটা এণ্ড হাওড়া, নীরী, ফোর রিপোর্টস (এপ্রিল '৭১-মার্চ ১৯৭৭)

৪। ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট।

৫। বেসলাইন ওয়াটার কোয়ালিটি স্টাডিজ অব হুগলি এসচুয়ারি (১৯৭২-'৭৪); নীরী।

৬। পলিউশন স্ট্যাটাস অব টালিস নালা এণ্ড সার্কুলার ক্যানাল (১৯৭৪-'৭৫): নীরী।

৭। ওয়াটার কোয়ালিটি অব দ্যা হুগলি আফটার ফারাক্কা ডিস্চার্জ (১৯৭৬-'৭৭)।

কুমারেশ মিত্র
ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র কলেজ

নির্যাতনের বিরুদ্ধে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভূমিকা

[The role of doctors in abetting or fighting the infliction of torture on prisoner and detenue is discussed. How doctors associated with the police and prisons help the process of torture here and elsewhere is indicated. A history of the movement organised in various countries by medical groups in identifying, exposing and fighting against torture is briefly outlined, together with some of their findings. The crying need and the possibilities for such a movement in our country are emphasised.]

সারা লাতিন আমেরিকায় অত্যাচার নির্যাতনের বন্যায় ধ্বংস হয়েছে শিল্প-সংস্কৃতির সংগ্রামী প্রচেষ্টা সত্তরের দশকের প্রায় প্রথমে। শিল্পী-সাহিত্যিকদের মৃত্যু বা নির্বাসন এতো বড় তালিকা এনে হাজির করেছিলো যে, ভ্লাদিমির হের্ংসোগ্ (Vladimir Herzog) হারিয়ে গেলো বিনা বাক্য-ব্যয়ে। ব্রাজিলের সুপরিচিত সাংবাদিক ও টেলিভিসন কালচারের (রাষ্ট্রীয় সংস্থা) পদস্থকর্মী হের্ংসোগ হাজিরা দিতে গেলো সামরিক গোয়েন্দা দপ্তরের (DOI-CODI) ডাকে। বন্দী করার কয়েক দিনের মধ্যেই, ২৫শে অক্টোবর ১৯৭৫, নির্জন সেলে হের্ংসোগ না কি গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে—গলায় দড়ির ছবি বেরোলো সরকারীভাবে। সে সময়—"সাংবাদিক, ছাত্র ও বিরোধীরা কেউই এই সৈন্যদের বক্তব্যের বিরুদ্ধে কিছু বলেন নি। তাদের আত্মীয়-বন্ধুরা হামেশাই তো ওখানে নিখোঁজ হয়ে যাচ্ছেন।"[১] তার ওপর হের্ংসোগের মৃত্যুর সার্টিফিকেট লিখেছে Sao Paulo Medical Legal Institute-এর প্রধান ডাক্তার হ্যারি শিবাতা (Harry Shibata) কাজেই, লাতিন আমেরিকার অন্যান্য অসংখ্য নির্যাতন বা নিখোঁজের ঘটনার মত, এ ঘটনাও হারিয়ে যেতো। কিন্তু Sao Paulo State Medical Council (CRM—SP) নিতান্ত আকস্মিকভাবে সন্দেহ করে বসলো সামরিক হাজতে হের্ংসোগের আত্মহত্যার ঘটনাকে। এ চ্যালেঞ্জের উৎস হলো, হের্ংসোগের মৃত্যুর পরে তোলা ফটো। কাজেই কাউন্সিলের চিকিৎসকদের সামনে হ্যারি শিবাতাকে হাজির হতে হলো। কাউন্সিলের সামনে হ্যারি শিবাতা স্বীকার করে ফেললো যে সে হের্ংসোগের মৃতদেহ দেখেই নি বা ময়নাতদন্তও করেনি !! ব্রাজিলের তরুণ ডাক্তাররা যখন ঘটনাকে নিয়ে নাড়াচাড়া করছে, তখন প্রকাশ হয়ে পড়ছে নির্যাতনের সমর্থক কিছু ডাক্তারের কালো চরিত্র।[২]

"ভালো লোকেরা কিছু না করে চুপ করে থাকাটাই শয়তানদের বিজয়লাভের জন্য একমাত্র প্রয়োজন।"—এডমাণ্ড বার্কের এই উক্তিটি ব্যবহার করে Tom Murton চিকিৎসকদের কদর্য্য ভূমিকা কেমন হতে পারে বর্ণনা করেছেন। টম মারটনের চাকরী চলে গিয়েছিল Arkansas State Penitentiary-র প্রধানের পদ থেকে—কারণ তিনি ১৯৬৮ সালে ঐ কারাগারের ভেতর মাটির নীচে তিনটি নরকঙ্কাল আবিষ্কার করেছিলেন। কারাগারের চিকিৎসকদের অজস্র সমর্থন ছিল

নির্যাতনের পেছনে। তাই কারাগারের চিকিৎসকদের সম্বন্ধে মারটন লিখেছেন—"কারাগার ব্যবস্থাটাই হোল তার মক্কেল এবং বন্দী রোগীরা হোল উপকরণ।"[৩]

চিকিৎসক Dimitrios Kofas-কে নির্যাতিত বন্দীরা বলতো "কমলালেবুর রসের ডাক্তার।" কারণ, সত্তরের দশকের প্রথমভাগে গ্রীসের নির্যাতিত বন্দীদের কাছে এই চিকিৎসক ছিল অত্যাচারীর সমর্থক—বন্দীদের ওষুধের প্রয়োজন হলে কোফাস্ 'আগামীকাল' ওষুধ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিতো।[৪]

সমগ্র বিশ্বেই যখন অমানুষিক অত্যাচার নির্যাতনের সাথে বহু চিকিৎসক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত তখন হিপোক্র্যাটিক শপথ বাক্য ছাড়াও কিছু আচরণবিধির প্রয়োজন হয়ে পড়লো। ওয়ার্ল্ড মেডিক্যাল ফেডারেশনের ২৯তম ওয়ার্ল্ড মেডিক্যাল এসেম্বলী যখন জাপানে টোকিও শহরে অনুষ্ঠিত হলো তখন সর্বসম্মতিক্রমে ১০ই অক্টোবর ১৯৭৫ সালে একটি ঘোষণা গৃহীত হোল। ঘোষণার মুখবন্ধে বলা হোল "The utmost respect for human life is to be maintained even under threat, and no use made of any medical knowledge contrary to the laws of humanity." ঘোষণায় অন্ততপক্ষে ৬টি ধারাতে torture বা নির্যাতনের ক্ষেত্রে চিকিৎসকের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমর্থনকে নীতি-বিরোধী ব্যাপার বলে দেখানো হোল। একজন চিকিৎসকের মানবিক ভূমিকা ও তার পেশাগত জ্ঞানকে স্বাধীনভাবে ব্যবহার করার কথাও বলা হোল। বলা হোল "The doctor's fundamental role is to alleviate the distress of his or her fellowmen, and no motive—whether personal, collective or political—shall prevail against this higher purpose." এ আচরণ-বিধির স্বপক্ষে ওয়ার্ল্ড মেডিক্যাল এ্যাসোসিয়েশন কাজ করার প্রতিশ্রুতিও দিলো।[৫]

১৯৭৫ সালের অগাষ্ট মাসে সিঙ্গাপুরে Council of National Representatives of the International Council of Nurses (ICN) একটি প্রস্তাবে বন্দীদের ক্ষেত্রে নার্সদের ভূমিকা কী হবে তা লিপিবদ্ধ করলো। তাতে বলা হোল :" Nurses having knowledge of physical or mental ill-treatment of detainees and prisoners take appropriate action including reporting the matter to appropriate national and/or international bodies."এই প্রস্তাবেও ICN মানবিকতার অধিকারের প্রশ্নে রাষ্ট্রসংঘের ঘোষণাকে পুনর্বার সমর্থন করলো।[৬]

তাহলে চিকিৎসা-বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে দুটি গুরুত্বপূর্ণ দিক দেখা যাচ্ছে : প্রথমত, কিছু চিকিৎসক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্যাতনের সাথে জড়িত এবং দ্বিতীয়ত, নির্যাতিত বন্দীদের চিকিৎসা বা রক্ষণা-বেক্ষণ প্রয়োজন। তাহলে চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের যদি মানবিক অধিকারের প্রশ্নটিকে গুরুত্ব দিতে হয় তাহলে—নির্যাতনের ক্ষেত্রে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ব্যবহারকে বিরোধিতা করে নির্যাতিত মানুষের স্বপক্ষে দাঁড়াতে হবে।

নির্যাতনের পদ্ধতির উল্লেখ বহু দিন আগেই নানাভাবে করা হলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকেই নির্যাতনের ফলাফলের চিকিৎসা-বিজ্ঞান ভিত্তিক গবেষণা শুরু হয়।[৭] নরওয়ে এবং ইজরায়েলে জীবিত কিছু কনসেন্-ট্রেশন ক্যাম্প প্রত্যাগত নির্যাতিত মানুষের ওপর গবেষণা চালানো হয়। ১৯৪৯ থেকে কয়েকটি চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণা পত্রে নির্যাতিত মানুষদের শারীরিক ও মানসিক অবস্থাকে আলোচনা করা হয়। এ ব্যাপারে নরওয়ে, ডেনমার্ক, কানাডা, আমেরিকার বিভিন্ন পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশ পায়। KZ Syndrome বা কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের নির্যাতনের সার্বিক শারীরিক ও মানসিক ফলাফল এবং উপসর্গগুলোর বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা পরবর্তী কালের গবেষণার সাহায্যে আসে। ১৯৭৩ সালে যখন অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল নির্যাতনের বিরুদ্ধে সম্মেলন করে—সেখানে সুসংবদ্ধ আলোচনার সূত্রপাত হয় যে, কি ভাবে নির্যাতনকে প্রমাণ করা এবং নিশ্চিহ্ন করা যায়। এই কাজটি করার উদ্দেশ্যে তখন চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের সামনে পূর্ববর্তী কোনো সংগঠন বা প্রচেষ্টার উদাহরণ ছিলো না—শুধু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কিছু গবেষণাপত্র ছাড়া। কাজেই যা করতে হলো—সমস্ত গবেষণা ও সংগঠন নতুন করে তৈরী করা। ঠিক এই কাজটি করার জন্যই Amnesty International-এর কয়েকজন মাত্র চিকিৎসক ডেনমার্কের নিউরোলজিষ্ট Inge Kemp Genefke-এর নেতৃত্বে ১৯৭৪ সালের অক্টোবর মাসে Danish Medical Group প্রতিষ্ঠা করলো। এদের প্রথম কাজ হোল নির্যাতনের সমর্থনে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের যে ব্যবহার তার বিরুদ্ধে একটি আন্তর্জাতিক চিকিৎসকদের আন্দোলন গড়ে তোলা। এবং দ্বিতীয়ত, নির্যাতনের বিভিন্ন কায়দাকানুনগুলোকে বৈজ্ঞানিক ভাবে গবেষণা করে প্রকাশ করে দেওয়া। কারণ, নির্যাতন বন্ধ করতে হলে, বৈজ্ঞানিকভাবে নির্যাতনকে প্রমাণ করা একান্ত জরুরী।

No medical group like this had ever been formed before, so no empirical material was available. Its organisation and method of working had to be developed without any existing model—বলেছেন এই পথিকৃৎ চিকিৎসকরা।[৭]

নির্যাতন বা Torture-কে শারীরিক ও মানসিক Stress হিসাবে বিশ্লেষণ করে, মানবিকতার অধিকারের স্বপক্ষের চিকিৎসকরা

প্রথমে আলোচনা করেন, যা ১৯৭৫ সালে প্রকাশিত হয়। নির্যাতন সম্পর্কে গবেষণা ব্যাপারটা কিন্তু ভিত্তি করে আছে সত্যিকারের নির্যাতিতদের কতখানি পরীক্ষা করা যাচ্ছে তার ওপর।

১৯৭৩ সালে চিলি থেকে চলে আসা কিছু উদ্বাস্তু যখন ডেনমার্কে এসে পৌঁছলো—এই সুযোগে এদের মধ্যে ৩২ জন নির্যাতিতকে চিকিৎসকরা পরীক্ষা করেন। আর কিছু চিকিৎসক গ্রীসে গিয়ে ৩৫ জন গ্রীক প্রাক্তন বন্দীকে পরীক্ষা করেন। কয়েকটি ফলাফলে দেখা যায় [৭]:

নির্যাতনের পদ্ধতি: সারণী—১

	চিলি	গ্রীস	মোট
	সংখ্যা—৩২	সংখ্যা—৩৫	সংখ্যা—৬৭
প্রহার	৩০	৩৩	৬৩
মাথায় প্রত্যক্ষ আঘাত	১৮	২৫	৪৩
Falanga বা ঝুলিয়ে পায়ের তলায় প্রহার	০	২৯	২৯
বৈদ্যুতিক অত্যাচার	২৭	৫	৩২
দু'দিনের বেশী ঘুমোতে না দেওয়া	৪	১১	১৫
দু'সপ্তাহের বেশী নির্জনে বন্দী	১০	২৬	৩৬
দু'দিনের বেশী জল বা খাবার না দেওয়া	৫	৫	১০
যৌন অত্যাচার	২	০	২
যৌনাঙ্গে প্রত্যক্ষ আঘাত	১৭	১১	২৮
পরিবার ও বন্ধুদের সম্পর্কে ভীতিপ্রদর্শন	১১	১১	২২
অন্যান্য অত্যাচার দেখতে বা শুনতে বাধ্য করা	১৩	১২	২৫
মৃত্যুর ভীতিপ্রদর্শন	১৩	৬	১৯
Pharmacological অত্যাচার	৩	১	৪
দন্ত নির্যাতন	৩	০	৩
পা বা হাত বেঁধে ঝোলানো	৯	৯	১৮
জল দ্বারা নির্যাতন	৩	১	৪
অন্যান্য অত্যাচার	১৮	২০	৩৮

নির্যাতনের পর উপসর্গ: সারণী—২

	চিলি	গ্রীস	মোট
	সংখ্যা—৩২	সংখ্যা—৩৫	সংখ্যা—৬৭
মানসিক গোলমাল	১৭	২৩	৪০
স্মরণশক্তি ও মনোযোগ নষ্ট	১৭	১৩	৪০
মাথাধরা	১২	১১	২৩
ঘুমে গোলমাল (ঘুম না হওয়া, অতিরিক্ত ঘুম, দুঃস্বপ্ন)	১৪	১১	২৫
অ্যালকোহল অসহ্য-লাগা	৪	৯	১৩
যৌন গণ্ডগোল	৪	৪	৮
শ্রবণশক্তি বাধাপ্রাপ্ত	৬	৯	১৫
সন্ধিস্থলে (Joint) যন্ত্রণা	৬	১০	১৬
চলাফেরায় অসুবিধা	১	১৪	১৫
দৃষ্টিশক্তিতে অসুবিধা	২	৫	৭
Cardiopulmonary উপসর্গ	৫	৬	১১
তলপেটে যন্ত্রণা	৪	১০	১৪
অন্যান্য উপসর্গ	১২	১৭	২৯

ওপরের দীর্ঘ সারণী দুটি দিতে হলো—কারণ বিশ্বে এই প্রথম সুসংহতভাবে চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা নির্যাতন পদ্ধতির সাথে তার ফলাফল সম্পর্কে পরীক্ষা চালালেন। পরবর্তী সমস্ত গবেষণায় এঁরা এই প্রথম পরীক্ষাটির উন্নতিসাধন করে গেছেন।

এখনো পর্যন্ত সব থেকে বিশদ পরীক্ষার রিপোর্ট হচ্ছে—আর্জেন্টিনার ১৪ জন নির্যাতিত সম্পর্কে। ডেনমার্কের চিকিৎসকরা এঁদের পরীক্ষা করেন আরো খুঁটিয়ে। দেখতে পেলেন নির্যাতন কি ভয়ানক শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতার জন্ম দেয়। এবার এটাও দেখা গেলো যে—আর্জেন্টিনায় নির্যাতিতরা ইতালী চলে আসার পর ১৯৭৯ সালে মে মাসে তাদের পরীক্ষা করা হয়। এই ১৪ জনের মধ্যে মাত্র দু'জন তাদের পূর্ববর্তী পেশা ইতালীতেও বজায় রাখতে পেরেছেন। বাকী সবাইয়ের পেশা আমূলভাবে পরিবর্তিত।[৮]

Telefono নামের নির্যাতনে (কানে আঘাত করা) শ্রবণশক্তি

ভাগলপুরে অন্ধ বন্দী ও চিকিৎসকের বিবেক

ভাগলপুরে যে বিচারাধীন বন্দীদের পুলিস অন্ধ করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে, তাদের কয়েকজন বলছে, তাদের অন্ধ করেছিলো এক ডাক্তার সাহেব। ভাগলপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসকরা এই অন্ধদের চিকিৎসা করার সুযোগ পেয়েও—প্রথমত আরোগ্যের আগে ছেড়ে দেয়, দ্বিতীয়ত জেলের চিকিৎসকদের জন্য কোনো ডিসচার্জ স্লিপ বা পরামর্শ দেয় নি। ভাগলপুরের এক ব্লক মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ এম. এল. আলি বলেন —'পুলিশ ৯ জন লোককে ব্লক ডিস্‌পেন্‌সারিতে ৬ই অক্টোবর নিয়ে আসে। তাদের প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয়। এটার আগে বা পরে কী হয়েছিলো জানি না।' প্রাথমিক চিকিৎসার সময় কেমন অবস্থা ছিলো? ক্ষতগুলো টাটকা ছিলো আর তখনও রক্ত গড়াচ্ছিলো।' (Indian Express, ৫. ১২. ৮০)

নষ্ট হওয়াটা সম্পর্কিত হতে পারে, Picana (বৈদ্যুতিক নির্যাতন) কোনো স্পষ্ট চিহ্ন রাখে কি না দেখা দরকার, Submarino (পরিষ্কার বা নোংরা জলে মাথা ডুবিয়ে রাখা) কোনো নিশ্বাস-প্রশ্বাসের অসুস্থতা আনে কি না—এমনি সব কিছুই চিকিৎসকরা আরো একটু বিশদ করে পরীক্ষা করলেন। এই পরীক্ষা আরো একটা সম্ভাবনাকে স্পষ্ট করলো—নির্যাতিতদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

ডেনমার্কে এ কাজ শুরু হয়েছিলো মাত্র ১০ জন চিকিৎসক নিয়ে। ১৯৮০ সালের প্রথমে সারা বিশ্বে ২২টি দেশে প্রায় চার হাজার চিকিৎসক নির্যাতনের বিরুদ্ধে কাজ করেছেন।[১] এ সংখ্যা প্রতি বছর অতি দ্রুত বেড়ে চলেছে। কিন্তু নিছক মানবিক অধিকারের এই প্রশ্নে একটি বিশেষ নীতিগত প্রেরণার বাইরে এটা ছড়াতে পারছে কি?

পশ্চিমের দুনিয়ার চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় এখন এঁদের কাজ সম্পর্কে রিপোর্ট প্রকাশিত হচ্ছে। যেমন: Forum on Medicine (June 1978), Canadian Doctor (October 1978), বা The New England Journal of Medicine (17 August 1978) পত্রিকায় নির্যাতনের বিরুদ্ধে চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের কাজের রিপোর্ট গুরুত্ব পেয়েছে। সম্প্রতি Danish Medical Bulletin-এর একটি সংখ্যা পুরোটাই (November 1980) এই বিষয়ের প্রবন্ধে পরিপূর্ণ।

দুটি ব্যাপার: প্রথমত পেশাগতভাবে চিকিৎসকরা নির্যাতনের বিরুদ্ধে কাজ করবেন; এবং দ্বিতীয়ত চিকিৎসা বিজ্ঞানের নৈতিকতা এই গবেষণার কাজে উৎসাহ দেবে। কাজেই পেশার ক্ষেত্রে সাফ কথা—Torture created sickness, and of course it is quite a natural thing for that one, who will cure sickness to work against torture —ডেনমার্কের অগ্রণী চিকিৎসকরা এই প্রশ্নে স্পষ্ট। কিন্তু পেশা ও নীতির মিলন একটা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড়ায়। চিকিৎসক তার বিজ্ঞান নিয়ে এগিয়ে আসে নির্যাতনের বিরুদ্ধে। নির্যাতনের পদ্ধতি যত সূক্ষ্ম হয়, তার বিরুদ্ধে চিকিৎসা বিজ্ঞান আরো জটিল পরীক্ষা-নিরীক্ষায় নেমে পড়ছে। কখনো সাধারণ সেকেলে পদ্ধতি, কখনো অতি আধুনিক পদ্ধতি গ্রহণ করে—বিশ্বের বহু চিকিৎসক নির্যাতনকে প্রকাশ করে দিচ্ছে।

সারা পৃথিবীর সব দেশের মতোই ভারতবর্ষের বন্দীদের উপর নির্যাতন করা হয়। রাজনৈতিক বা অরাজনৈতিক যে কোন বন্দীদের ওপরেই। নির্যাতনের ধাপগুলি এরকম—কোন ব্যক্তিকে বন্দী করার মুহূর্তে, বন্দী করে পুলিশ হাজতে, বিচারাধীন বা সাজাপ্রাপ্ত বন্দী হিসাবে কারাগারে নির্যাতন করা হয়। নির্যাতন চালানোর মুহূর্তে বা পরে যতবার প্রয়োজনীয় চিকিৎসার জন্য চিকিৎসক দরকার, প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রে চিকিৎসকরা নির্যাতনকারীকেই সাহায্য করে থাকে। ফলে প্রত্যক্ষভাবে নির্যাতনের সময়ে বা ফলশ্রুতি হিসাবে নির্যাতিত ব্যক্তি শারীরিক ও মানসিকভাবে অসুস্থ বা পঙ্গু হয়ে পড়ে। বিশ্বের অন্যান্য দেশে নির্যাতনের সাথে ভারতে নির্যাতনের পদ্ধতির অজস্র মিল আছে। উদাহরণ স্বরূপ, গ্রীসে ঝুলিয়ে পায়ের তলায় আঘাত করাকে 'ফালাঙ্গা' বলা হয় আর ঐ একই অত্যাচারকে উত্তর ভারতে 'কুর্সি চরণ' এবং পূর্ব ভারতে বা পশ্চিমবঙ্গে 'কচুয়া' বলা হয়। খোদ পশ্চিমবঙ্গে প্রত্যেকটি থানায় নির্যাতন ব্যবস্থা থাকা ছাড়াও বিভিন্ন গোপন ব্যবস্থায় যেমন District Intelligence Branch (D. I B.), Detective Department (D. D.), Special Branch (S. B.), ইত্যাদির ব্যবস্থাপনায় অত্যন্ত সুসংগঠিত নির্যাতন করার ব্যবস্থা আছে। এমন কি বৈদ্যুতিক অত্যাচার বা মানসিক অত্যাচার, এমন কি স্নায়ু শিথিলকারী ওষুধ প্রয়োগে অত্যাচার এই পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষে সর্বত্র চালু আছে। অত্যাচারের ফলে বন্দীদের অসুস্থ হওয়া ও মৃত্যুর ঘটনা অসংখ্য। এই সমস্ত ঘটনায় নির্যাতনের স্বপক্ষে হাজতে বা কারাগারে অনেক চিকিৎসক জড়িত। আবার এই নির্যাতনের বিরুদ্ধে ভারতীয় চিকিৎসকদের নীরবতা এমন একটা জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে, যে নির্যাতনকারীদের বিরুদ্ধে সামান্যতমও পদক্ষেপ গ্রহণ হয়নি বা হচ্ছে না। নির্যাতনের বিরুদ্ধে ভারতীয় চিকিৎসকরা দুভাবে কাজ করতে পারেন—প্রথমতঃ Amnesty International-এর আওতায় Medical Group সংগঠিত করা (1980 সালে এ ধরণের একটি Group গঠিত হয়েছে)। সেক্ষেত্রে চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা ভারত ছাড়া বিশ্বের যে কোন নির্যাতন সম্পর্কে গবেষণা করতে পারেন—কারণ এটাই এদের সাংগঠনিক নীতি। দ্বিতীয়তঃ, ভারতীয় যে কোন চিকিৎসক বা চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের সংগঠন ভারতের যে কোন ধরণের নির্যাতন সম্পর্কে কাজ করতে পারেন (যেমন ব্রাজিলে Medical Council কাজ করছেন)। ভারতে চিকিৎসকদের সংখ্যা অবিশ্বাস্য রকম বেশী, চিকিৎসা বিজ্ঞানের সুযোগ সুবিধা ও যন্ত্রপাতি অনেক আধুনিক দেশের সমকক্ষ। এক্ষেত্রে আর্থিক সমস্যা একান্ত অবান্তর। কারণ স্বয়ং Danish Medical Group ডেনমার্কে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সরকারের অজস্র সাহায্য নিজেদের দক্ষতায় আদায় করে নিয়েছেন এবং নীতি হিসাবেই চিকিৎসা বিজ্ঞানের এ ধরণের কাজকর্ম অবশ্যই অন্যান্য সবরকমের Academic এবং Professional কাজকর্মের তুল্য করে তুলেছেন। বৃহৎ ইতিহাস ভারতীয় নির্যাতনের, বৃহৎ ব্যাপ্তি ভারতীয় চিকিৎসকদের—যা প্রয়োজন তা হোল গভীর এক সমাজবোধ এবং নীতিবোধ।

এখানে নির্যাতনের বিরুদ্ধে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভূমিকা সম্পর্কে

শুধু একটি ছোট্ট ভূমিকা করা হোল মাত্র। বিভিন্ন দেশে চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের এ বিষয়ে সংগঠন ও গবেষণার পদ্ধতি সম্পর্কে ভবিষ্যতে অপর প্রবন্ধে আলোচনা করার চেষ্টা করা হবে।

সৌমেন গুহ

নির্দেশিকা ঃ

১. Sight and Sound (Summer, 1976)
২. Amnesty International Newsletter, July 1980
৩. Prisons (New York 1972)
৪. Torture in Greece (Amnesty International, 1977)
৫. Declaration of Tokyo of the World Medical Association, 1975
৬. Resolution adopted by International Council of Nurses, Singapore, 1975
৭. Evidence of Torture (Amnesty International, 1977)
৮. Results of Examinations of 14 Argentinian Torture Victims (Danish Medical Group, 1979)
৯. Politiken (ড্যানিশ ভাষার দৈনিক সংবাদপত্র), 30 March 1980

'ভেক' প্রকল্প ঃ ত্বরক যন্ত্রের সন্ধানে

[Some of the problems associated with the quest for modern accelerators on the part of under-developed countries are pointed out. A brief introduction to the Variable Energy Cyclotron now being installed at Salt Lake, Calcutta, is presented. The inherent weakness of such a project, as manifested through several alleged and documented failures in making the machine operational, is indicated.]

পরমাণুর ভিতর থাকে কেন্দ্রক বা 'নিউক্লিয়াস'। তার চারধারে ঘোরে ইলেকট্রন। কেন্দ্রকে রয়েছে ধনাত্মক আধান বা 'পজিটিভ চার্জ'। ইলেকট্রনের ঋণাত্মক আধান এই ধনাত্মক আধানকে নাকচ করে বলে পরমাণুতে নীট আধান কিছু থাকে না। কিন্তু কোনভাবে কেন্দ্রকের চারধারের ইলেকট্রনগুলিকে বাদ দিয়ে শুধু কেন্দ্রককে বা কেন্দ্রকের ভিতরকার কোন অংশকে মুক্ত করতে পারলে সেটি হবে একটি আহিত কণা। তড়িৎক্ষেত্রের সাহায্যে তখন সেই কণার গতিবেগ বাড়ানো যাবে। গতিবেগ বাড়িয়ে কণাটিকে উচ্চশক্তি সম্পন্ন করতে পারলে তার সাহায্যে অন্য কোন কেন্দ্রক বা কণিকার সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটিয়ে কেন্দ্রকের গঠনরহস্য জানার চেষ্টা করা যেতে পারে। যে যন্ত্রের সাহায্যে কেন্দ্রক বা অন্য কোন অধোপারমাণবিক (' সাব-অ্যাটমিক') আহিত কণিকার গতিবেগ তথা শক্তি বাড়ানো হয় তাকে বলা হয় ত্বরকযন্ত্র বা 'অ্যাকসিলারেটর'।

ত্বরক যন্ত্রের ব্যবহার কেবল কেন্দ্রকের গঠনরহস্য জানার বা কেন্দ্রকের চেয়েও ক্ষুদ্রতর মৌল কণিকাগুলির ধর্ম বোঝার গবেষণাতেই নয়, এর ব্যবহার রয়েছে বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের কেন্দ্রকে পরিবর্তন ঘটিয়ে নানান ধরনের 'আইসোটোপ' তৈরীতেও। গবেষণার কাজে ছাড়াও আইসোটোপগুলিকে আজকাল বহু গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহারিক কাজে লাগান হচ্ছে। কৃষিবিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিজ্ঞানে প্রয়োগ এগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আধুনিক বিজ্ঞানচর্চায় ত্বরকযন্ত্র প্রচণ্ড গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দখল করে রয়েছে। 'উন্নত' দেশগুলি ত্বরকযন্ত্রের পিছনে জলের মত কোটি কোটি টাকা খরচ করছে। অতি-অধুনিক ত্বরকযন্ত্রগুলি সত্যিই এক একটি প্রযুক্তিগত বিস্ময়। তবে এই আধুনিক যন্ত্রগুলির মূল ব্যবহার হল মৌলকণা সংক্রান্ত উন্নত গবেষণায়। 'মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট' বা এম-ই-ভি নামে শক্তির যে এককটী রয়েছে এই উন্নত ত্বরক যন্ত্রগুলির লক্ষ্য হল বিভিন্ন কণিকাকে তার হাজারগুণ, দশহাজারগুণ বা তারও অনেক বেশী শক্তিতে নিয়ে যাওয়া। এর আগেকার পর্যায়ের যন্ত্রগুলির লক্ষ্য ছিল একশ' এম-ই-ভি বা তার কয়েকগুণ। এগুলিরও প্রধান উদ্দেশ্য গবেষণা। আইসোটোপ বানানোর জন্য সাধারণত ব্যবহৃত হয় এর চেয়েও কম ক্ষমতাসম্পন্ন যন্ত্র যা উন্নত দেশগুলিতে তৈরী হয়েছিল আরো আগেকার পর্যায়ে।

ত্বরকযন্ত্র নিয়ে মাথা ঘামায় শুধু 'উন্নত' দেশগুলিই নয়, তথাকথিত উন্নতিশীল দেশগুলিও যার মধ্যে রয়েছে ভারত। কিন্তু ত্বরকযন্ত্রের

ব্যাপারে এই দেশগুলির ভাবনাচিন্তা বা কর্মসূচীতে অনেকসময়ই এক অদ্ভুত অসংলগ্নতা ও উদ্দেশ্যহীনতার ছাপ থেকে যায়। নানা কারণে এসব দেশে এখনো উন্নত গবেষণার ক্ষেত্র বা পরিমণ্ডল গড়ে ওঠেনি। কিন্তু তবু এগুলিতে উন্নত ও অতি-আধুনিক ত্বরকযন্ত্র বসানোর হুজুগ লক্ষ্য করা যায়। এর জন্য খরচ হয় বহু কোটি টাকা, যা হয়ত আরো অনেক বেশী প্রয়োজনীয় খাতে খরচ করা যেত। এই খরচ পুরোপুরি অপচয়ে পর্যবসিত হয় দুটি কারণে: (ক) উন্নত গবেষণার ক্ষেত্র ও পরিমণ্ডল না থাকায় যন্ত্রগুলি তৈরী হওয়ার পর ঠিকমত গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হতে পারে না। যে যন্ত্রগুলি তৈরী হয় স্বভাবতই সেগুলি 'উন্নত' দেশগুলির সর্বাধুনিক যন্ত্রগুলির সঙ্গে তুলনীয় নয়। অনেকক্ষেত্রেই এই ধরনের যন্ত্র তৈরী হয় 'উন্নত' কোন দেশে আগেকার কোন পর্যায়ে তৈরী কোন যন্ত্রের অনুকরণে। ফলে এই যন্ত্রের সাহায্যে যে গবেষণা সম্ভব তার মূল উপাদানগুলি আগেই কোন-না কোন 'উন্নত' দেশে বাস্তবায়িত হয়েছে। উন্নত গবেষণার উদ্দেশ্যে তৈরী হয়েও অর্থবহ কোন গবেষণায় ব্যবহৃত হতে না পারায় যন্ত্রগুলি অত্যন্ত দামী আবর্জনায় পরিণত হয়। (খ) এই ধরনের যন্ত্র তৈরীর উপযুক্ত গবেষণা-প্রযুক্তি-শিল্পের শক্ত ভিং না থাকায় যন্ত্র তৈরীর পর্যায়ে নানারকম বিভ্রাট দেখা দেয়। পরিকল্পিত সময়ে যন্ত্র তৈরীর কাজ শেষ হয় না। বিভিন্ন যন্ত্রাংশে ছোটবড় নানারকম গণ্ডগোল দেখা দেয়। এবং অনেক সময় যন্ত্র তৈরী হওয়ার পরও প্রায় অকেজো হয়ে থাকে। বিদেশী যন্ত্রাংশ ও কারিগরির উপর নির্ভরশীলতার বহু-পরিচিত কুফলগুলি ত' রয়েইছে।

শুধু ত্বরকযন্ত্রই নয়, অন্যান্য আরো বহু ক্ষেত্রে এই ধরনের ঘটনা লক্ষ্য করা যায়। তারাপুরের পারমাণবিক চুল্লীটি এর একটি উল্লেখ-যোগ্য নিদর্শন। কলকাতার সল্ট লেকে 'ভেরিয়েবল এনার্জি সাইক্লোট্রন' ত্বরকযন্ত্রটিও এই ধারার ব্যতিক্রম নয়। এই যন্ত্র নির্মাণের কর্মসূচী সংক্ষেপে 'ভেক' (ভি-ই-সি) প্রকল্প নামে পরিচিত।

সাইক্লোট্রন যন্ত্রে একটি তড়িৎচুম্বকের সাহায্যে জোরালো চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি করা হয়। যে কণিকাকে দ্রুত গতিসম্পন্ন করতে হবে সেটি 'আয়ন সোর্স'এ মুক্ত হয়ে এই চৌম্বকক্ষেত্রের ভিতর বৃত্তাকার পথে ঘুরতে থাকে। প্রতিটি বৃত্তাকার পাকের অর্ধেক অংশ কণিকাটিকে থাকতে হয় ইংরাজি 'D' এর আকারে একটি ট্যাংকের ভিতর (অনেক সময় দু'টি 'ডি'ও ব্যবহার করা হয়)। এই ট্যাংকে উচ্চ কম্পাঙ্কের পরিবর্তী বিভব বা 'এ-সি-ভোল্টেজ' প্রয়োগ করা হয়। ফলে প্রতিবার ট্যাংকের মুখে ঢোকার ও বেরুবার সময় বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের প্রভাবে কণিকাটির শক্তি বৃদ্ধি পায় ও সেটি আরো বড় ব্যাসার্ধের বৃত্তাকার পথে প্রবেশ করে। এইভাবে যখন কণিকাটি 'ডি' এর সীমানার কাছে চলে আসে তখন তাকে একটি বিক্ষেপক পাতের সাহায্যে বাইরে বার করে আনা হয়। 'ডি' সহ কণিকাটির পুরো গতিপথ আবদ্ধ থাকে একটি বায়ুশূন্য কক্ষে।

'ভেক' যন্ত্র এই সাইক্লোট্রনেরই একটি উন্নততর সংস্করণ। এতে যে চৌম্বকক্ষেত্র সৃষ্টি করা হয় তা অত্যন্ত শক্তিশালী এবং এই চৌম্বক ক্ষেত্রের শক্তি প্রয়োজনমত বাড়ান বা কমানোর ব্যবস্থা রয়েছে। এর ফলে কণিকার চূড়ান্ত গতিশক্তির মাত্রা ইচ্ছামত নির্ধারিত করা যায়। সল্ট লেকে যে 'ভেক' প্রকল্প চলছে তাতে প্রোটন কণিকাকে সর্বোচ্চ ৬০ এম-ই-ভি পর্যন্ত, ডয়টেরনকে (হাইড্রোজেনের আই-সোটোপ) ৬৫ এম-ই-ভি পর্যন্ত ও আলফা কণিকাকে ১৩০ এম-ই-ভি পর্যন্ত শক্তি দেওয়া যাবে।[১] এত উচ্চ শক্তিসম্পন্ন হওয়ার ফলে কণিকাগুলির ভরের পরিবর্তন ঘটবে ও যে সরু রশ্মিপথে সেগুলির প্রবাহিত হওয়ার কথা তার তীব্রতা হ্রাসের সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে। এই সম্ভাবনা নাকচ করার জন্য তড়িৎচুম্বকের চৌম্বক দ্বারদুটিকে বিশেষ আকৃতি দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে।

যন্ত্রটি ঠিকমত কাজ করছে কিনা তা সূচিত করার জন্য বিভিন্ন সূচক রাশির মান উদ্ধৃত করা প্রয়োজন। কণিকার চূড়ান্ত গতিশক্তি ছাড়া এই রাশিগুলির অন্যতম হল কণিকারশ্মির তীব্রতা বা ঐ রশ্মি দ্বারা বাহিত তড়িৎপ্রবাহের মাত্রা।

'ভেক' প্রকল্পের কারিগরী পরিকল্পনা ও নক্সা তৈরী হয় ১৯৬৭-৬৯ সালে। আমেরিকার বার্কলীতে ও টেক্সাসে অবস্থিত দুটি যন্ত্রের অনুকরণে রচিত হয় এই নক্সা।[২] প্রকল্পটি নেওয়া হয় ভারত সরকারের পারমাণবিক শক্তি বিভাগ 'ডি-এ-ই' থেকে। প্রথমে পরিকল্পনা রূপায়নের লক্ষ্য ধরা হয় ১৯৭৪ সাল।[২] কিন্তু তারপর দেখা দিতে থাকে একের পর এক বিভ্রাট ও পেছুতে থাকে প্রকল্পের কাজ শেষ হওয়ার সময়। বিভ্রাটগুলি কি কি তা অবশ্য কখনও প্রকাশ্যে আলোচিত হয় নি, তবে জনশ্রুতিতে কয়েকটি দুর্ঘটনা ও বড় ধরনের গলদের কথা শোনা যায়। গোড়ার দিকে প্রকল্পের একটি বাড়ীর ছাদ ধ্বসে পড়ার কথা শোনা গিয়েছিল। তার পর শোনা গেল একটি চৌম্বক দ্বারের আকৃতিতে গলদ ধরা পড়েছে। চৌম্বক দ্বার তৈরীর ভার ছিল রাঁচীর হেভী এঞ্জিনীয়ারিং কর্পোরেশনের উপর। সম্প্রতি নাকি 'ডি' ট্যাংকটিকে পুরো খুলে আবার নতুন করে বসানো হয়েছে। এটিও সম্ভবত কোন গলদের ফলশ্রুতি। প্রকল্পের কাজ শেষ হওয়ার পরিকল্পিত সময় ১৯৭৪ থেকে পেছিয়ে দাঁড়িয়েছিল ১৯৭৭এ।[১] কিন্তু আজ ১৯৮১ সালেও ভেক যন্ত্র কার্যক্ষম হয় নি। প্রকল্পের কর্তৃপক্ষ দাবী করেছেন যে ১৯৭৭-এর জুন মাসে নাকি ৫০ এম-ই-ভি শক্তি সম্পন্ন আলফা কণিকার আভ্যন্তরীণ রশ্মি ('ইনটারনাল বীম' অর্থাৎ 'ডি' ট্যাংকের ভিতর ট্যাংকের সীমানার কাছে কণিকা-গুচ্ছ) পাওয়া গিয়েছিল।[৩] কিন্তু এ প্রসঙ্গে দুটি বিষয় লক্ষণীয়:

(ক) এ পর্যন্ত ঐ একটিবার (ও পরে আর একবার) ছাড়া আর কখনো আভ্যন্তরীণ রশ্মি পাওয়ার দাবী করা হয় নি ;

(খ) যন্ত্রটিতে যেখানে আভ্যন্তরীণ রশ্মির তীব্রতা হওয়ার কথা ১০০ মাইক্রোঅ্যামপিয়ার, কার্যক্ষেত্রে সেখানে যে রশ্মি পাওয়া গেল তার তীব্রতা ছিল মাত্র ০·১২ মাইক্রোঅ্যামপীয়ার, অর্থাৎ যা হওয়া উচিৎ তার মাত্র ৮০০০ ভাগের এক ভাগ।

আরো দাবী করা হয়েছে যে ১৯৭৮ সালের জুলাই মাসে নাকি নিঃসৃত রশ্মিও ('এক্সটারনাল বীম' অর্থাৎ বিক্ষেপক পাত্রের সাহায্যে 'ডি' ট্যাংকের বাইরে প্রক্ষিপ্ত কণিকাগুচ্ছ) পাওয়া গেছে। কিন্তু এটিও ঐ একবারই। তা ছাড়া নিঃসৃত রশ্মির শক্তিও অনেক কম, মাত্র ৩০ এম-ই-ভির আলফা কণিকা। আর ঐ রশ্মির তীব্রতা ? সে বিষয়ে কর্তৃপক্ষ নীরব।[৩] আন্তর্জাতিক আলোচনা সভায় অবশ্য নীরব থাকলে চলে না। সেখানে বলা হয় যে নিঃসৃত রশ্মির তীব্রতা 'নমিনাল' অর্থাৎ অতি সামান্য।[১]

১৯৭২-এর একটি রিপোর্টে বলা হয়েছিল যে ত্বরকযন্ত্রের খরচ পড়বে ডলারের হিসাবে ২৫ লক্ষ ডলার, আর মোট প্রকল্পের খরচ হবে ৮৫ লক্ষ ডলার।[২] ১৯৭৮-এর রিপোর্টে খরচের অঙ্ক বাড়িয়ে বলা হয়েছে যথাক্রমে ৩০ লক্ষ ও ১০৭ লক্ষ ডলার। তার পর খরচের মাত্রা আরো কত বেড়ে গেছে কে জানে।

'ভেক' যন্ত্রটি যখন কাজ করবে (যদি আদৌ তা করে !)* তখন তা দিয়ে যে কি গবেষণার কাজ হবে সে বিষয়ে বিজ্ঞানীদের ভিতর সংশয় রয়েছে। হয়ত এই যন্ত্রের সাহায্যে কিছু 'গবেষণা' ও ডক্টরেট থীসিস হবে ঠিকই কিন্তু এর পিছনে যে কোটি কোটি টাকা ঢালা হচ্ছে তার তুলনায় সে গবেষণার মূল্য কতটা থাকবে, প্রশ্ন সেটাই।

'ভেক' প্রকল্পই শেষ নয়। ত্বরকযন্ত্রের আলেয়া হাতছানি দিচ্ছে আরো দূর থেকে। দেশের মানুষ এ সম্পর্কে অবহিত না হলে আরো অনেক বেশী সম্পদ জলাঞ্জলি যাবে এই ত্বরকযন্ত্রের নামে।

* অতি সম্প্রতি খবরের কাগজে বলা হয়েছে যে 'ভেক' যন্ত্রটি নাকি কার্যক্ষম হয়েছে।

সূত্র :

১। প্রসিডিংস অফ দ্য এইট্থ ইণ্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন সাইক্লোট্রন্স অ্যাণ্ড দেয়ার অ্যাপ্লিকেশনস, ইণ্ডিয়ানা, সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮।

২। ঐ, সিক্স্থ ইণ্টারন্যাশনাল সাইক্লোট্রন কনফারেন্স, ভ্যানকুভার ক্যানাডা, জুলাই, ১৯৭২।

৩। আই-ই-ই-ই ট্র্যানজাকশন্স অন নিউক্লিয়ার সায়েন্স, খণ্ড : এন-এস ২৬, সংখ্যা ২, এপ্রিল ১৯৭৯।

অভিজিৎ লাহিড়ী
বিদ্যাসাগর সান্ধ্য কলেজ

সংস্থার সাধারণ সভার খবর

গত ২৪শে ডিসেম্বর ১৯৮০, বিজ্ঞান কর্মী সংস্থার সাধারণ সভা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজের ফলিত রসায়ন বিভাগে অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ববর্তী সাধারণ সভার কার্য বিবরণী সভায় গৃহীত হয়। সম্পাদকের বিবৃতিতে সংস্থার কাজকর্মে কর্মীর অভাব, দায়িত্বগ্রহণ করার অভাবের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। JACARI যে সব আন্দোলন করে, তার সাথেও বর্তমানে সংস্থার যোগসূত্রের দুর্বলতার কথা বলা হয়। এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন সদস্য বিতর্ক করেন। সম্পাদকের বিবৃতিতে সাম্প্রতিক কাজকর্মের অসুবিধাগুলির সাথে ভবিষ্যতের সাংগঠনিক সমস্যাকে তুলে ধরা হয়। 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান কর্মী'র বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করেন পার্থ সেন। নতুন গ্রাহক ও নবীকরণ করার জন্য দু'সপ্তাহের একটি প্রচেষ্টার প্রস্তাব গৃহীত হয়। সংস্থার ব্যবস্থাপনায় অটোমেশন, বিজ্ঞানের ইতিহাস এবং বার্ণালের সম্পর্কে আলোচনাচক্র করার প্রস্তাব বিবেচনার জন্য রাখা হয়। ১৯৮১-৮২ সালের নির্বাচনের ব্যবস্থা করার জন্য পাঁচজনের একটি উপসমিতি গঠিত হয়। সভার শেষে সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানান।

বিজ্ঞপ্তি

পত্রিকার নাম : বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী
প্রকাশনার ভাষা : বাংলা ও ইংরাজী
প্রকাশনার স্থান : ৫২/১ সি, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা : ৭০০ ০১২
প্রকাশনার কাল : দ্বিমাসিক
প্রকাশকের নাম : রবীন মজুমদার জাতি—ভারতীয় ;
ঠিকানা—ফলিত রসায়ন বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ৯২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা : ৭০০ ০০৯
মুদ্রকের নাম : রবীন মজুমদার জাতি—ভারতীয় ;
ঠিকানা—ফলিত রসায়ন বিভাগ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ৯২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা ৭০০ ০০৯
সম্পাদকের নাম : পার্থ সেন জাতি—ভারতীয় ;
ঠিকানা—নরসিংহ দত্ত কলেজ, হাওড়া
প্রেসের নাম : মুদ্রাকর প্রেস
ঠিকানা : ১০/১ সি, মারহাট্টা ডিচ লেন, কলিকাতা ৭০০ ০০৩
এতদ্বারা বিবৃত করছি যে, উপরি-উক্ত ঘোষণা আমার বিশ্বাস ও জ্ঞান অনুযায়ী সত্য।

স্বাক্ষর
রবীন মজুমদার

স্বল্পমেয়াদী ডাক্তারী পাঠ্যক্রম ঃ একটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ

জনগণ চিকিৎসা চান, সরকার চান জনসমর্থন আর ডাক্তাররা চান অর্থ। এই বিবিধ চাওয়ার টানাপোড়েনে এক অদ্ভুত নাটক জমে উঠেছে পশ্চিমবাংলায়। রাজ্য সরকারের প্রবর্তিত তিন বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা মেডিক্যাল কোর্সটি ডাক্তারদের কাছে একেবারেই না-পছন্দ। ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন, কিছু কিছু ছাত্র সংগঠন এবং খোদ ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল কাউন্সিল এর বিরোধিতায় নেমেছেন। তাঁদের প্রধান প্রধান যুক্তি হল ঃ মাত্র তিন বছরে অ্যানাটমি, ফিজিওলজি, কেমিস্ট্রি, মেডিসিন, সার্জারী ইত্যাদি সব বিষয়ে মোটামুটিরকম ভালোভাবেও পড়ানো ও শেখানো সম্ভব নয়। ছাত্রদের মানও ভাল না হওয়ারই সম্ভাবনা। অতএব, ফল দাঁড়াবে—অর্ধ-শিক্ষিত ডাক্তার। দ্বিতীয়ত, হাসপাতাল, হেলথ সেণ্টার, যা আছে, সরকার সেগুলিই ভালভাবে চালাতে পারছে না। উপযুক্ত ব্যবস্থা, ওষুধপত্র, সাজসরঞ্জাম ইত্যাদির চরম অভাব ইচ্ছে থাকলেও ডাক্তারদের মনমত চিকিৎসার পক্ষে বিরাট বাধা। সরকারের বরং উচিত এদিকে দৃষ্টি দেওয়া, তাতে সমস্যার সমাধান সহজতর হবে। তৃতীয়ত, গ্রামে ডাক্তারা যেতে চান না বা সেরকম যথেষ্ট সংখ্যক ডাক্তার নেই, একথাও ঠিক নয়। সরকারই বরং বেশ কিছু চাকুরীপ্রার্থী এম.বি.বি.এস ডাক্তারকে নিয়োগ করে রাজ্যের তাবৎ হাসপাতাল হেলথ সেণ্টারে পাঠাতে চাইছেন না। তাছাড়াও, রাজ্যের সাতটি মেডিক্যাল কলেজ থেকে আগামী পাঁচ বছরে যত সংখ্যক ছাত্র এম বি. বি. এস ডিগ্রী নিয়ে বেরোবে—যারা একটি ন্যূনতম সময়ের জন্য সরকারী চাকরী করার জন্য চুক্তিবদ্ধ—তাদের সকলকে নিযুক্ত করার মত যথেষ্ট সংখ্যক সরকারী পদই বরং নেই। চতুর্থত, ডিপ্লোমা ডাক্তাররাও গ্রামে থাকতে চাইবে না, বরং গ্রাজুয়েট (এম. বি বি. এস) ডিগ্রী পাবার জন্য তারা নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করবে, আর তাদের দাবী সরকারকে মানতেও হবে, ফল দাঁড়াবে যথাপূর্বং।.....ইত্যাদি। এই ধরণের যুক্তি বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে, অতএব ক্ষোভ ও রাগের কথাও কিছু কিছু বেরিয়ে আসছে—নতুন কোর্সটি নিতান্তই একটি মেড-ইজি কোর্স ; গ্রামের মানুষদের স্বাস্থ্য নিয়ে ছেলেখেলায় মেতেছেন সরকার ; প্রমোদবাবু, জ্যোতিবাবু, ননীবাবুরা কি অসুস্থ হ'লে ডিপ্লোমা ডাক্তারদের শরণাপন্ন হবেন? আসলে, এটি রাজ্য সরকারের স্টান্টবাজী মাত্র। ইত্যাদি।

রাগ-ক্ষোভের কথা থাক, বিরোধিতার যুক্তিগুলি কতটা টেঁকসই তাই বরং বুঝে দেখার চেষ্টা করা যাক। প্রথম যুক্তিটি নিতান্তই সাবজেকটিভ্। যে কেউ চ্যালেঞ্জ জানিয়ে প্রমাণে নামতে পারেন যে দশ বছরের কমে কিছুতেই কোন পূর্ণাঙ্গ ডাক্তারী শিক্ষা সম্ভব নয়, আবার তিন বছরের অনেক কম সময়েও যে কার্যোপযোগী ডাক্তারী শিক্ষা দেওয়া সম্ভব তারও ভুরি ভুরি নজির আছে। আসলে যা দরকার, তা হ'ল লক্ষ্য ও পন্থার নির্দিষ্টতা। বর্তমান ক্ষেত্রে লক্ষ্য অবশ্যই সুনির্দিষ্ট।

গ্রাম-শহরের সরকারী স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলি নানাধরণের অভাব, অব্যবস্থা, দুর্নীতি ইত্যাদির শিকার হয়েছে এটা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু তার পেছনে ডাক্তারদের একাংশের দায়িত্বও কম নয়। হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত থেকেও ঢালাও প্রাইভেট প্র্যাকটিস অনেকেই করেন। শুধু তাই নয়, হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত থাকাটা তাঁদের অনেকেরই ব্যক্তিগত ক্লিনিক এবং/অথবা নার্সিং হোমের রমরমা ব্যবসার জন্য একান্ত প্রয়োজন। আউটডোরে রোগী দেখার সময়েই হাসপাতালেরই অন্য ঘরে বসে কুড়ি-তিরিশ টাকা ফি নিয়ে স্পেশাল রোগী দেখছেন এমন নজিরও আছে। এসব জিনিষ কি সরকার আইন করে বা প্রহরী বসিয়ে বন্ধ করতে পারেন? অবশ্য, সরকারের কিছুই করণীয় নেই—একথা আদৌ বলছি না।

এম. বি. বি. এস ডাক্তাররা গ্রামে যেতে চান না, চাইলেও কতদিন থাকবেন বা থাকতে পারবেন সে বিতর্কে আপাতত না যাওয়াই ভাল। বরং, মনে হয় অনিচ্ছুক ডাক্তারকে জোর করে গ্রামে পাঠানোর চেষ্টা করাই উচিত নয়। তাতে অধিকাংশ সময়ে ফল খারাপই হয়ে থাকে। আর সরকারী ডাক্তারী পদ কটি এবং অদূর ভবিষ্যতে তার কতগুলি এম. বি. বি. এস ডাক্তাররা অলঙ্কৃত করবেন সে হিসেবেরও গোড়ায় গলদ। কারণ রাজ্যের তাবৎ মানুষের চিকিৎসার চাহিদা শুধুমাত্র চাকুরে ডাক্তার দিয়ে পূরণ হয় না, হ'তে পারে না। পশ্চিমবাংলার গ্রামাঞ্চলে ন্যূনাধিক চার কোটি মানুষের জন্য গড়ে যেখানে বর্তমানে দশ হাজার মানুষ পিছু মাত্র একজন ডাক্তার আছেন, সেখানে জনগণের সুচিকিৎসার আশা দুরাশা। যদি আগামী বছর পাঁচেকের মধ্যে এই অনুপাতটা কমিয়ে পাঁচ হাজারে একজন ডাক্তারও করতে হয় (মোটামুটি সন্তোষজনক অবস্থার জন্য যা হওয়া উচিত প্রায় 1500 : 1) তাহ'লেও এখনকার তুলনায় হাজার চারেক ডাক্তার বেশী প্রয়োজন। অথচ নবপ্রবর্তিত কোর্সে 1983'র পর প্রতি বছর পাশ করে বেরোবে মাত্র শ'দেড়েক ডাক্তার। সুতরাং এম. বি. বি. এস ডাক্তারদের বা ছাত্রদের এতে আতঙ্কিত হবার কিছু নেই।

গ্র্যাজুয়েট এবং ডিপ্লোমা ডাক্তাররা একে অপরের পরিপূরক ভূমিকা

পালন করবেন, প্রতিদ্বন্দ্বীর নয় এই আকাঙ্ক্ষা মোটেই বাস্তব রূপ নেবে না, এই হ'ল চতুর্থ যুক্তির বক্তব্য। কিন্তু ডিপ্লোমা ডাক্তারদের জান-প্রাণ পড়ে থাকবে এম. বি. বি. এস ডিগ্রীটি পাবার দিকে—এটা ভাবা ঠিক নয়। • ডিপ্লোমা ছাত্রছাত্রীদের সামাজিক অবস্থান, তাদের পাঠ্যক্রম, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী, আর্থিক অবস্থা ইত্যাদি এত কিছুর উপর এই মানসিকতা নির্ভরশীল যে আংকিক কোন গণনা দিয়ে এমন নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না। তাছাড়া কিছু অভিজ্ঞতার পর ডিপ্লোমা ডাক্তারদের কেউ কেউ গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রী পেতে চাইলে বা পেলে, তা অন্যায় বা ক্ষতিকর কোনটাই হবে না। বরং সব দিক থেকেই সেটা• কাম্য। এরকম যুক্তি যাঁরা দেখান তাঁরা নিজেরা হয়তো বুঝতে পারেন না যে এর উৎস হ'ল সেই একই ধরণের ঈর্ষা, যার প্রভাবে আয়ুর্বেদের ছাত্রদের মেডিক্যাল কলেজে কোন ক্লাশ করতে না দেবার দাবীতে 'আন্দোলন' হয়।

তবে একদিক থেকে এই সব যুক্তি-তর্ক এবং আন্দোলন যে হচ্ছে সেটা ভালোই। এর ফলে যদি এম. বি. বি এস এবং আরও উচ্চ ডিগ্রীধারী কিছু ডাক্তারের এবং ডাক্তারী ছাত্রদের একাংশের চরম স্বার্থপরতা প্রকট হয়ে থাকে তবে মানবিকতা, শুভবুদ্ধি ও খোলা মন সম্পন্ন সামাজিকভাবে সংবেদনশীল ডাক্তার এবং ছাত্রদের নিষ্ক্রিয়-তাও ফুটে কম উঠেনি। সরকারী ব্যবস্থার একপেশোমিও জনসাধারণ বুঝতে পারছেন।

আমরা তাই বলব যে স্বল্পমেয়াদী ডিপ্লোমা কোর্স স্বাগতম, কিন্তু আসন সংখ্যা ধীরে ধীরে আরও বাড়ানো উচিত। এবং এখানেই থেমে গেলে চলবে না। ক্রমে ক্রমে সামগ্রিক স্বাস্থ্যপ্রকল্পে বিশেষ বিশেষ লক্ষ্য পূরণে আরও স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হওয়া দরকার। নতুন কোর্সে প্রশিক্ষণ কিভাবে হবে সে বিষয়েও সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্কভাবে কাজ করতে হবে কেননা অধুনা প্রচলিত মেডিক্যাল কলেজগুলির পথ অনুসরণ করতে গেলে সুফলের চেয়ে কুফলের সম্ভাবনা প্রবল। •দেশে বিদেশে নজীর সৃষ্টিকারী বহু সফল পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে যেখানে চিকিৎসার মূল কথা হল গোটা একটা মানুষ—সামাজিক মানুষ; তার একটি বিশেষ রোগ বা অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গ নয়। ডাক্তারী কাজের সহায়ক কর্মীর (যেমন, নার্স, কম্পাউণ্ডার, নানাধরণের টেকনিসিয়ান ইত্যাদি প্যারামেডিক্যাল কর্মীর) সংখ্যা ও গুণগত মান বাড়ানোর জন্যই বা সরকার কি উদ্যোগ নিচ্ছেন তা জানা নেই। এ ব্যবস্থা না হলে অপ্রয়োজনীয় অনেক টেকনিক্যাল কাজ করতেই ডাক্তারদের অনেক সময় নষ্ট হবে। ছাত্র ভর্তির ব্যাপারে দুর্নীতি বন্ধ করার জোরদার ব্যবস্থা নেওয়া দরকার, গ্রামের ছেলে / মেয়ে ডাক্তার হয়ে গ্রামে কাজ করলে স্বাভাবিকভাবেই কমিউনিটির কাছে দায়বদ্ধতার বোধ জন্মায়। সকল মেধাবী ছাত্র ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার দরজা যাতে বন্ধ না হয় তাও দেখা দরকার। মেডিক্যাল কলেজগুলির সামাজিক ও প্রতিরোধমূলক চিকিৎসা (Social & Preventive Medicine) বিভাগ—যেগুলিকে নানা কৌশলে নগন্য-জঘন্য করে রাখা হয়েছে, সেগুলির পুনরুজ্জীবন একান্ত প্রয়োজন। গ্রামাঞ্চলের হেলথ সেণ্টারগুলির সামান্য ওষুধপত্রও যাতে কোন বিশেষ ব্যক্তি বা ব্যক্তিগোষ্ঠীর সেবায় নিঃশেষ না হয় সেদিকেও সজাগ দৃষ্টি দিতে হবে।

উল্লিখিত ফাঁক ফোকড়গুলি যদি বন্ধ না করা যায় তবে আশানুরূপ সুফল নীচ পর্যন্ত শুধু পৌছবে না তাই নয়, তেলা মাথা আরও একটু তৈলাক্ত হবে মাত্র।

শেষ বিচারে অবশ্য উপযুক্ত খাদ্য, পানীয় জল, স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থার এবং জনগণের বৈজ্ঞানিক চেতনার উপর সমস্ত কিছুই নির্ভরশীল। সাধারণভাবে সমস্ত বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানকর্মীরা একটি বিজ্ঞান আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়াসের মাধ্যমে এইসব ব্যাপারে পরোক্ষ কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। সরকারেরও দায়িত্ব আছে এ ধরণের প্রয়াসকে উৎসাহ দেওয়ার।

স্বল্পমেয়াদী ডাক্তারী শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে বেশী বেশী সংখ্যায় সাধারণ ডাক্তার (General Practitioners) গড়ে তোলার প্রয়োজনের কথা বহুজন বহুভাবে বহুদিন ধরেই বলে আসছেন। ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন প্রকাশিত নানা রচনাতেও এর ইঙ্গিত আছে। ভোরে কমিটি (Bhore Committee 1943) জনস্বাস্থ্যের প্রয়োজন মেটানোর চেষ্টার উপর জোর দিলেও স্বাধীন ভারতে তার অপব্যাখ্যার মাধ্যমে, একের পর এক নগরকেন্দ্রিক ব্যয়-বহুল হাসপাতাল ও মেডিক্যাল কলেজ গড়ে তোলা হল। এবং বোঝার উপর শাকের আঁটি যোগ হল প্রাক্তন এল. এম. এফ, এল এম. সি ইত্যাদি পাঠ্যক্রমের উচ্ছেদে। সাধারণ দরিদ্র গ্রামবাসীর সামান্য বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার সুযোগটুকুও কেড়ে নেওয়া হল। গ্রামাঞ্চলের চিকিৎসার বিচারে অবস্থা এমনিতেই যথেষ্ট খারাপ। শুধুমাত্র ডিপ্লোমা কোর্সটি প্রবর্তনের ফলেই অবস্থা আরও খারাপ হবে—এমনকথা মেনে নেওয়ার মত কোন যুক্তি নেই। তবে চিকিৎসার কাজে যাঁরা যুক্ত আছেন বা অদূর ভবিষ্যতে যুক্ত হবেন তাঁদের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া যে পরিকল্পনাটি কোন সুফল বয়ে আনবে না তা সকলেই বুঝতে পারছি।

রবীন মজুমদার
বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

বিজ্ঞান-বিচিত্রা দ্বিমাসিক পত্রিকা, সম্পাদক—দেবানন্দ দাস
(অবলা প্রকশনী, পোঃ যোগেন্দ্রনগর, আগরতলা-৭৯৯০০৪)

যারা বলেন বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানকে সুখপাঠ্য করে পরিবেশন করা যায় না তাঁরা পড়ে দেখুন জ্যোতিপ্রকাশ রায়চৌধুরীর লেখা 'মাছ যখন ডাক্তার' শীর্ষক প্রবন্ধটি, পড়ে দেখুন ডঃ রেখা দত্তের লেখা 'গাছ কি সুর-রসিক ?' শীর্ষক প্রবন্ধটি। দুটো লেখাই প্রকাশিত হয়েছে 'বিজ্ঞান-বিচিত্রা' পত্রিকার ১৯৮০-র সেপ্টেম্বর সংখ্যায়। 'বিজ্ঞান-বিচিত্রা' দ্বিমাসিক পত্রিকা, বিগত পাঁচ বছর ধরে এটি নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে আগরতলা থেকে।

আশার কথা, বাংলায় বিজ্ঞান-চর্চা ইতিমধ্যে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। বেশ কিছু বিজ্ঞান-বিষয়ক পত্র পত্রিকা বেরোচ্ছে। কোন কোন পত্রিকা অবশ্য স্ফুলিঙ্গের মতো 'ক্ষণকালের আনন্দে' আত্মপ্রকাশ করেই মিলিয়ে যাচ্ছে। 'বিজ্ঞান-বিচিত্রা' তেমন কোন স্বল্পস্থায়ী প্রকাশ নয়, এর স্থায়িত্ব সম্পর্কে আমরা নিশ্চিন্ত হতে পেরে খুশী হয়েছি। বাংলায় বিজ্ঞান-বিষয়ক পত্রিকা টিঁকিয়ে রাখার নানা সমস্যা আছে। আর্থিক সমস্যা তাদের অন্যতম, কিন্তু তার চেয়েও বড়ো সমস্যা হলো ভাল লেখা পাবার সমস্যা। বিজ্ঞান-বিচিত্রারও নিশ্চয়ই সে সমস্যা রয়েছে, কিন্তু তবু বিগত সংখ্যাগুলো পড়ে বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, এ পত্রিকার সঙ্গে বেশ কিছু শক্তিশালী লেখক যুক্ত হয়েছেন। তাই আমাদের বিশ্বাস, পত্রিকাটি স্থায়ী হবে এবং বাংলায় বিজ্ঞান-চর্চার পথ সুগম করে জনসাধারণকে বিজ্ঞান-মনস্ক করে তোলার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে পারবে। কিন্তু তা করতে হলে সম্পাদককে আর একটু সতর্ক হতে হবে। লেখা-নির্বাচনের সময় লেখার চেয়ে লেখকের ডিগ্রি বা অন্যান্য পোষাকী পরিচয়গুলো বেশি গুরুত্ব পেলে এ ধরনের পত্রিকা চালানোর উদ্দেশ্যটাই ব্যর্থ হতে পারে। বিজ্ঞান-বিচিত্রা পত্রিকার সব কটা সংখ্যা পড়ে ফেলার সুযোগ আমার হয় নি, যে কটা সংখ্যা পড়েছি তাদের মধ্যে অধিকাংশ লেখা সুনির্বাচিত হলেও অন্তত একটি ক্ষেত্রে লেখা-নির্বাচনে চরম অসতর্কতার সাক্ষ্য আছে। ১৯৮০ সালের উৎসব সংখ্যায় (অক্টোবর-নভেম্বর সংখ্যায়) 'আবিষ্কারের পিছনে' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে। এ প্রবন্ধের লেখক ডঃ ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা। লেখক-পরিচিতি পড়ে আমরা জেনেছি, ডঃ সেনশর্মা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রীডার, তার লেখা বেশ কয়েকটি বই বাজারে চালু। এও জেনেছি যে, তিনি 'প্রকৃতি প্রেমিক ও দারুণ খেয়ালী'। 'আবিষ্কারের পিছনে' শীর্ষক প্রবন্ধ লেখার পেছনে 'দারুণ খেয়ালী' এ মানুষটির দারুণ খেয়ালই বোধ করি প্রেরণা জুগিয়েছিল। 'আবিষ্কারের পিছনে' প্রবন্ধটিতে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সম্পর্কে যে-সব কথা বলা হয়েছে বিজ্ঞান-চেতনা আচ্ছন্ন না থাকলে কেউ সে-সব কথা লিখতে পারেন বলে আমরা মনে করি না। অথচ আশ্চর্য, যিনি লিখেছেন তিনি একজন বিজ্ঞানী এবং লেখক-পরিচিতি অনুসারে 'বাংলা ভাষার জনপ্রিয় বিজ্ঞান প্রবন্ধ রচনায় যে ক'জন বিজ্ঞানী বিজ্ঞান-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন এবং এখনো প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন ডঃ সেনশর্মা তাঁদের অন্যতম।'

এবার আসুন, প্রবন্ধটি সম্পর্কে একটু আলোচনা করা যাক। 'আপেল ফলটি মাটিতে পড়ল কেন ?' এ প্রশ্ন দিয়ে প্রবন্ধটি শুরু। পাঠক জিজ্ঞাসু হয়ে পড়তে শুরু করে কয়েকটি লাইন পড়েই একটি হোঁচট খাবেন যেখানে লেখক হাস্যকর এলিটারেশনে এক চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন—"ফলত, ইতিহাস খ্যাতিতে ঐ একটি ফলের fallই নিউটনের ফলন্ত জীবনের ফলাও ফলশ্রুতি।' বাক্যটির আলংকারিক উৎকর্ষের বিচারে যেতে চাই না। এ বাক্যে তিনি যা বলতে চেয়েছেন তাই আমাদের আলোচ্য। ডঃ সেনশর্মা বলতে চান যে, সঠিক মুহূর্তে আপেলটি নিউটনের চোখের সামনে না পড়লে মাধ্যাকর্ষণ সূত্রটি আবিষ্কার সম্ভবপর হতো না। 'আপেল ও নিউটন' প্রসঙ্গটি প্রথমে কার উর্বর মস্তিষ্ক থেকে উদ্ভূত হয়েছিল তা আমরা জানি না। কী জানি—হয়তো নিউটনের কোন জীবনীকার এ ঘটনাটি আবিষ্কার করেছিলেন তাঁর কল্পনায়। সাহিত্যের সত্য আর বিজ্ঞানের সত্য এক নয়। সাহিত্যে 'সেই সত্য যা রচিবে তুমি, ঘটে যা তা সত্য নহে।' কোন জীবনীকার যদি সাহিত্যের প্রয়োজনে আপেল পড়ার গল্পটি ফেঁদে থাকেন—কোন বিজ্ঞান-বুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষ নিশ্চয়ই বিনা বিচারে তাকে সত্য বলে মেনে নেবেন না। ডঃ সেন শর্মার কাছে আমাদের জিজ্ঞাস্য, বৃন্তচ্যুত ফল যে মাটিতে পড়ে, উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত বস্তু যে নিচের দিকে নেমে আসে নিউটন কি এর আগে সে কথা জানতেন না ? বিজ্ঞানের ইতিহাসটা খুলে দেখলেই কিন্তু জানা যাবে যে, গ্যালিলিও-র পতনশীল বস্তুর সূত্র নিয়ে নিউটন নানা গবেষণা করেছেন। যে নিউটন পতনশীল বস্তুর সূত্রাদি সম্পর্কে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন তিনি একটি আপেল পড়তে না দেখলে মহাকর্ষসম্বন্ধীয় সত্যে উপনীত হতে পারতেন না এ কথা যারা প্রচার করেন তাদের বিজ্ঞান-চেতনা সম্পর্কে যদি আমাদের মনে সন্দেহ উপস্থিত হয় তবে সে সন্দেহ নিশ্চয়ই ভিত্তিহীন নয়।

ডাঃ সেনশর্মা এক জায়গায় লিখেছেন 'আবিষ্কার' (discovery)

এবং 'উদ্ভাবন' (invention)—এ দুটো শব্দের ব্যবহারে আমরা প্রায়ই গোলমাল করে বসি। এর পর আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের পার্থক্য বোঝাতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, "কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করেন"—একথাটা যতোই আমরা মুখস্থ করে থাকি ছোটবেলায়, আসলে বলা উচিত "কলম্বাস আমেরিকার যাত্রাপথ উদ্ভাবন করেন।" মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। আপনারাই ভেবে দেখুন 'আবিষ্কার' এবং 'উদ্ভাবন'-এর পার্থক্য ডাঃ সেনশর্মার কাছে পরিষ্কার কিনা।

আলোচনা আর দীর্ঘতর করতে চাই না। শুধু এটুকু বলছি যে, প্রবন্ধটিতে বিজ্ঞানচেতনার চিহ্নমাত্র না থাকলেও প্রচুর হাস্যরসের উপাদান সেখানে রয়েছে যা পড়ে রামগরুড়ের ছানারাও অট্টহাস্যে ফেটে পড়বে। টেস্ট অব পুডিং ইজ ইন্ দি ইটিং। তাই আমার পরামর্শ —যারা বিজ্ঞানসাহিত্যে বিজ্ঞানবর্জিত হাস্যরস খুঁজছেন তাঁরা একবার ডাঃ সেনশর্মার 'আবিষ্কারের পিছনে' প্রবন্ধটি পড়ুন। দু'একটা দৃষ্টান্ত কেবল নমুনা হিসেবে আপনাদের কাছে তুলে ধরবো ঐ প্রবন্ধটি থেকে।

(১) 'পৃথিবীতে অনেক বৎসরে, অনেক আবিষ্কার হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে। প্রায় প্রতি মুহূর্তেই পৃথিবীর নানাপ্রান্তে কোনো না কোনো আবিষ্কার হয়ে চলছে। সে আবিষ্কার কখনো বড়ো, কখনো মেজো, কখনো ন'-রাঙা-ছোট। বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, আবিষ্কারের বীজ হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে, হাত বাড়ালেই তাকে ধরা যায়।'

(২) 'মোনালিসার শিল্পীর নাম জানেন বোধ হয়—লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি। ঐ ভদ্রলোক কে জানেন? জিনিয়াস শুধু নয়—জিনিয়াসের বাণ্ডিল।'

সাধু! এমন সুপারলেটিভের ব্যবহার বাংলায় সত্যিই দুর্লভ।

'বিজ্ঞান-বিচিত্রা' পত্রিকা পর্যালোচনা করতে গিয়ে তাতে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করার হয়তো প্রয়োজন ছিল না। বিজ্ঞান নিয়ে যাঁরা আছেন, যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াচ্ছেন, ছাত্রপাঠ্য বই লিখছেন, বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার জন্য লিখছেন তাঁদের কাছ থেকে এমন লেখা অপ্রত্যাশিত ও বেদনাদায়ক বলেই এতগুলো কথা লিখতে হলো।

'বিজ্ঞান-বিচিত্রা' পত্রিকার চারটি সংখ্যা আমার হাতে এসেছে। প্রতিটি সংখ্যাতেই বেশ কিছু ভাল লেখা নজরে পড়েছে। এ পত্রিকা হাতে নিলে প্রথমেই যা নজর কেড়ে নেয় তা হলো প্রবন্ধগুলোর আকর্ষণীয় শিরোনামা। 'এনজাইম ঘটকালি', 'একটি রঙিন স্বপ্ন ও রাং' 'বাবা নয়, দু'জন মা = ভ্রূণ', 'জল যখন মারক', 'মাছ যখন ডাক্তার'—শিরোনামাগুলো চোখে পড়লেই পাঠকরা প্রবন্ধগুলোর প্রতি আকৃষ্ট হবেন। উক্ত প্রবন্ধগুলোর প্রায় প্রতিটিই সুলিখিত; সাধারণ পাঠকরাও এসব প্রবন্ধ থেকে অনেক কিছু জানতে পারবেন। বিজ্ঞানের প্রতি পাঠক-সাধারণের আগ্রহ বাড়ানোর জন্য এ ধরণের লেখার খুবই প্রয়োজন। 'বিজ্ঞান-বিচিত্রা' পত্রিকার বিষয়সূচীতেও যথেষ্ট বৈচিত্র্য রয়েছে; যেমন 'বিজ্ঞানের ছড়া, শব্দকূট, ভেবে কর, বিজ্ঞান-শিক্ষার আসর, বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সংকলন, গ্রন্থ পর্যালোচনা ইত্যাদি। বাংলা ভাষায় যে-সব বিজ্ঞান-বিষয়ক পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে, বিষয়ের বৈচিত্র্যে, পরিবেশনের উৎকর্ষে 'বিজ্ঞান-বিচিত্রা' তাদের মধ্যে বিশেষ স্থান দাবি করতে পারে।

অজয় চক্রবর্তী

চিঠিপত্র

মাননীয় সম্পাদক, বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

মহাশয়,

'সমস্যা: প্রথম পাঠ' (দীপাঞ্জন রায় চৌধুরী, বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি, 1981) লেখাটি কাজের। এ-বিষয়ে আলোচনা উচিত। সেই সঙ্গে আরও দু-একটি কথা মনে আসছে।

1. অবৈজ্ঞানিক পাঠ্যপুস্তক, লিখিত ভাষার অযৌক্তিক জটিলতা —এগুলো শিক্ষাবিস্তারের প্রধান বাধা নয়। ঐ সমস্যাগুলো সম্পর্কে শিক্ষাসচেতন, ভাষাসচেতন ব্যক্তি উদাসীন থাকতে পারেন না। কিন্তু মূল কথা, বৈজ্ঞানিক অবৈজ্ঞানিক কোনোরকম শিক্ষার সুযোগ অধিকাংশ শিশুর কাছে পৌঁছয় না।

2. কোনটা বেশি প্রয়োজন—শিক্ষার বিষয়কে সহজ ভাবে শিশুর কাছে পৌঁছে দেওয়া, না শিক্ষার বিষয়কে অবিকৃত ভাবে শিশুর কাছে পৌঁছে দেওয়া? শিক্ষার সময় অল্প পাওয়াটাই কি শিশুর নিয়তি?

3. ভাষায় বানান ও বর্ণমালার সরলীকরণের কাজ কোথায় শুরু হওয়া উচিত—ওপরের স্তরে না নীচের স্তরে? ওপরের স্তর বলতে বুঝি সাহিত্য রচনা, প্রবন্ধ রচনা, দৈনন্দিন কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত বিবিধ রচনার স্তর। নীচের স্তর বলতে বুঝি প্রাথমিক শিক্ষার পাঠক্রম। ওপরের স্তরের পরিবর্তনগুলো ধীরে ধীরে নীচের স্তরে আত্মপ্রকাশ করবে—এটাই কি স্বাভাবিক নয়?

পদ্মনাভ দাশগুপ্ত
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী

সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে পার্থ সেন কর্তৃক সম্পাদিত ও রবীন মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও
মুদ্রাকর প্রেস, ১২/১সি, মারহাট্টা ডিচ লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত।

Registration No R. N. 34129/79 "Registered" Postal Regi. No. WB/CC 113

এবং 'উদ্ভাবন' (invention)—এ দুটো শব্দের ব্যবহারে আমরা প্রায়ই গোলমাল করে বসি। এর পর আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের পার্থক্য বোঝাতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, "কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করেন"—একথাটা যতোই আমরা মুখস্থ করে থাকি ছোটবেলায়, আসলে বলা উচিত "কলম্বাস আমেরিকার যাত্রাপথ উদ্ভাবন করেন।" মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। আপনারাই ভেবে দেখুন 'আবিষ্কার' এবং 'উদ্ভাবন'-এর পার্থক্য ডাঃ সেনশর্মার কাছে পরিষ্কার কিনা।

আলোচনা আর দীর্ঘতর করতে চাই না। শুধু এটুকু বলছি যে, প্রবন্ধটিতে বিজ্ঞানচেতনার চিহ্নমাত্র না থাকলেও প্রচুর হাস্যরসের উপাদান সেখানে রয়েছে যা পড়ে রামগরুড়ের ছানারাও অট্টহাস্যে ফেটে পড়বে। টেস্ট অব পুডিং ইজ ইন্ দি ইটিং। তাই আমার পরামর্শ —যারা বিজ্ঞানসাহিত্যে বিজ্ঞানবর্জিত হাস্যরস খুঁজছেন তাঁরা একবার ডাঃ সেনশর্মার 'আবিষ্কারের পিছনে' প্রবন্ধটি পড়ুন। দু'একটা দৃষ্টান্ত কেবল নমুনা হিসেবে আপনাদের কাছে তুলে ধরবো ঐ প্রবন্ধটি থেকে।

(১) 'পৃথিবীতে অনেক বৎসরে, অনেক আবিষ্কার হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে। প্রায় প্রতি মুহূর্তেই পৃথিবীর নানাপ্রান্তে কোনো না কোনো আবিষ্কার হয়ে চলছে। সে আবিষ্কার কখনো বড়ো, কখনো মেজো, কখনো ন'-রাঙা-ছোট। বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, আবিষ্কারের বীজ হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে, হাত বাড়ালেই তাকে ধরা যায়।'

(২) 'মোনালিসার শিল্পীর নাম জানেন বোধ হয় —লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি। ঐ ভদ্রলোক কে জানেন? জিনিয়াস শুধু নয়—জিনিয়াসের বাণ্ডিল।'

সাধু! এমন সুপারলেটিভের ব্যবহার বাংলায় সত্যিই দুর্লভ।

'বিজ্ঞান-বিচিত্রা' পত্রিকা পর্যালোচনা করতে গিয়ে তাতে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করার হয়তো প্রয়োজন ছিল না। বিজ্ঞান নিয়ে যাঁরা আছেন, যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াচ্ছেন, ছাত্রপাঠ্য বই লিখছেন, বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার জন্য লিখছেন তাঁদের কাছ থেকে এমন লেখা অপ্রত্যাশিত ও বেদনাদায়ক বলেই এতগুলো কথা লিখতে হলো।

'বিজ্ঞান-বিচিত্রা' পত্রিকার চারটি সংখ্যা আমার হাতে এসেছে। প্রতিটি সংখ্যাতেই বেশ কিছু ভাল লেখা নজরে পড়েছে। এ পত্রিকা হাতে নিলে প্রথমেই যা নজর কেড়ে নেয় তা হলো প্রবন্ধগুলোর আকর্ষণীয় শিরোনামা। 'এনজাইম ঘটকালি', 'একটি রঙিন স্বপ্ন ও রাং' 'বাবা নয়, দু'জন মা = ভ্রূণ', 'জল যখন মারক', 'মাছ যখন ডাক্তার'—শিরোনামাগুলো চোখে পড়লেই পাঠকরা প্রবন্ধগুলোর প্রতি আকৃষ্ট হবেন। উক্ত প্রবন্ধগুলোর প্রায় প্রতিটিই সুলিখিত; সাধারণ পাঠকরাও এসব প্রবন্ধ থেকে অনেক কিছু জানতে পারবেন। বিজ্ঞানের প্রতি পাঠক-সাধারণের আগ্রহ বাড়ানোর জন্য এ ধরণের লেখার খুবই প্রয়োজন। 'বিজ্ঞান-বিচিত্রা' পত্রিকার বিষয়সূচীতেও যথেষ্ট বৈচিত্র্য রয়েছে; যেমন 'বিজ্ঞানের ছড়া, শব্দকূট, ভেবে কর, বিজ্ঞান-শিক্ষার আসর, বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সংকলন, গ্রন্থ পর্যালোচনা ইত্যাদি। বাংলা ভাষায় যে-সব বিজ্ঞান-বিষয়ক পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে, বিষয়ের বৈচিত্র্যে, পরিবেশনের উৎকর্ষে 'বিজ্ঞান-বিচিত্রা' তাদের মধ্যে বিশেষ স্থান দাবি করতে পারে।

অজয় চক্রবর্তী

চিঠিপত্র

মাননীয় সম্পাদক, বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

মহাশয়,

'সমস্যা: প্রথম পাঠ' (দীপাঞ্জন রায় চৌধুরী, বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি, 1981) লেখাটি কাজের। এ-বিষয়ে আলোচনা উচিত। সেই সঙ্গে আরও দু-একটি কথা মনে আসছে।

1. অবৈজ্ঞানিক পাঠ্যপুস্তক, লিখিত ভাষার অযৌক্তিক জটিলতা —এগুলো শিক্ষাবিস্তারের প্রধান বাধা নয়। ঐ সমস্যাগুলো সম্পর্কে শিক্ষাসচেতন, ভাষাসচেতন ব্যক্তি উদাসীন থাকতে পারেন না। কিন্তু মূল কথা, বৈজ্ঞানিক অবৈজ্ঞানিক কোনোরকম শিক্ষার সুযোগ অধিকাংশ শিশুর কাছে পৌঁছয় না।

2. কোনটা বেশি প্রয়োজন—শিক্ষার বিষয়কে সহজ ভাবে শিশুর কাছে পৌঁছে দেওয়া, না শিক্ষার বিষয়কে অবিকৃত ভাবে শিশুর কাছে পৌঁছে দেওয়া? শিক্ষার সময় অল্প পাওয়াটাই কি শিশুর নিয়তি?

3. ভাষায় বানান ও বর্ণমালার সরলীকরণের কাজ কোথায় শুরু হওয়া উচিত—ওপরের স্তরে না নীচের স্তরে? ওপরের স্তর বলতে বুঝি সাহিত্য রচনা, প্রবন্ধ রচনা, দৈনন্দিন কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত বিবিধ রচনার স্তর। নীচের স্তর বলতে বুঝি প্রাথমিক শিক্ষার পাঠক্রম। ওপরের স্তরের পরিবর্তনগুলো ধীরে ধীরে নীচের স্তরে আত্মপ্রকাশ করবে—এটাই কি স্বাভাবিক নয়?

পদ্মনাভ দাশগুপ্ত
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী

সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে পার্থ সেন কর্তৃক সম্পাদিত ও রবীন মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও
মুদ্রাকর প্রেস, ১৮/১সি, মারহাট্টা ডিচ লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত।